বঙ্গ

কমলবার্তা

মে সংখ্যা। ২০২৪

দেশের সঙ্গে বাংলাতেও আসছে গেরুয়া ঝড়

আবার একবার
মোদী সরকার

শেষ ১৫ বছর
এক নজরে
বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

তৃণমূলী হুমায়ুনের সাম্প্রদায়িক হুঁশিয়ারি

প্রসঙ্গ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

বাংলায় মোদীর গ্যারান্টি
ধর্মের ভিত্তিতে
সংরক্ষণ হতে দেব না

সন্দেশখালির গর্জনে ধরাশায়ী মমতা

শিক্ষা দুর্নীতিতে ল্যাজেগোবরে তৃণমূল

বারাণসী লোকসভা কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দিলেন নরেন্দ্র মোদী।

কানপুরের গুমতির গুরুদ্বার শ্রী কীর্তনগড় সাহিব-এ প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা।

গান্ধীনগর লোকসভা কেন্দ্রের আমেদাবাদে ভোট দেওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী।

তেলেঙ্গনায় নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে লক্ষ্মীপুরম গ্রামে
প্রধানমন্ত্রী স্নেহবন্ধনে এক ভবিষ্যৎ নাগরিক।

গুজরাটের বনাসকাঁথা লোকসভা কেন্দ্রে দুগ্ধ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত
মহিলা উদ্যোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গ
কমলবার্তা

মে সংখ্যা। ২০২৪

প্রাণ থাকতে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হতে দেব না: মোদীর গ্যারান্টি ৪
জয়ন্ত গুহ

শিক্ষা নিয়ে তৃণমূলের জোচ্চুরি ৮
পুলক নারায়ণ ধর

সন্দেশখালির জনগর্জন ১০
বিনয়ভূষণ দাশ

সচিত্র হীরক রানির কুকীর্তি (পর্ব-৬) ১৩

ছবিতে খবর ১৬

হুমায়ুনের হুঁশিয়ারি ২২
দিব্যেন্দু দালাল

বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: শেষ ১৫ বছর এক নজরে ২৫
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিরূপ ঘোষ

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি: প্রসঙ্গ, সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ ৩০
রুবী সাঁই

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

দেশের সঙ্গে বাংলাতেও আসছে। ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়। হ্যাঁ ঠিক শুনছেন, দেশের সঙ্গে বাংলাতেও প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে গেরুয়া ঝড়। এ ঝড়ের হদিশ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে পাওয়া যায়না। হিংসা, লোভ আর চাতুরীতে যখন চারিপাশ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন ওঠে এই ঝড়। প্রবলভেদী সেই ঝড়ে ভেসে যায় সব অভিসন্ধি। এ ঝড় ভারতবর্ষ প্রথম দেখেছিল ২০১৪ সালে। দেখেছে ২০১৯ সালেও। তবে সে ছিল ট্রেলার। এবারই আসছে, সঙ্কল্প নেওয়া ভূবনভেদী সেই প্রবল ঝড়।

যে ঝড়ে নিভে যাওয়া চিতাও হু হু করে জ্বলে ওঠে আতঙ্কে। সন্দেশখালির মাতৃশক্তির চোখের আগুনে জন্ম নেওয়া পাতালভেদী সেই ঝড় কালভৈরব হয়ে আছড়ে পড়ার আগে নাকি অজানা আশঙ্কায় প্রবল হিংস্র মানবীর চোখের তারা থেকে শেষ মমতা-টুকুও বিদায় নেয়। ঠিকরে বেরিয়ে আসে চোখ। একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। অজানা এক ভয়ে দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে এদিক-ওদিক এদিক-ওদিক পায়চারী করতে করতে কপাল ফেটে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে বদ রক্ত। কিন্তু কি করে কপাল ফাটল তা নিয়ে আর কিছুই মনে থাকেনা। কেননা 'শেষ মমতা' বিদায় নিতে হিংস্র মানবী তখন উন্মাদ হয়ে গেছে সব হারানোর ভয়ে। চারিপাশের দেওয়াল ক্রমশ কাছে সরে এসে ঘিরে ধরে খাঁচার মত।

মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর সেই মুহূর্তে কিছুই করার থাকেনা। শুধু খাঁচার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে হেরে যাওয়ার আগে নিষ্ফলা হুঙ্কার আর আর্তনাদ। এ ভীষণ সময়ে শওকত মোল্লা-জাহাঙ্গীর-শাহজাহানের মত বাঘ বা অনুব্রত-র মত বীর কেউ এগিয়ে আসেনা। শুধু দূর থেকে দেখে আর থরথর করে কাঁপে।

রুদ্রযোগী এই ভীষণ গেরুয়া ঝড়ে গান্ধী পরিবারের শাহজাদার পাপের প্রাসাদে ১০০ প্রদীপ জ্বলবে নাকি প্রদীপে সলতে দেওয়ার জন্যও কেউ থাকবেনা তা হয়ত বলতে পারবেন কাশীর কোতোয়াল – কালভৈরব জি। কিন্তু যে দেশে সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলে গরীব হিন্দু পরিবারের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি এবং এসসি-এসটি-ওবিসিদের সংরক্ষণ কেড়ে নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের বিলিয়ে দিতে চায় কংগ্রেস, যে দেশে কংগ্রেসেরই শাখামূল তৃণমূল কংগ্রেস শাহজাদার ইশতেহার ঘোষণার আগেই নিঃশব্দে সন্দেশখালিতে রেখা পাত্রের মত অসংখ্য অসহায় গরীব হিন্দু দলিত পরিবারের জমি লুঠ করে বন্টন করে দিয়েছিল শাহজাহানদের হাতে, জমি দিতে না চাইলে যে মমতা-হীন তৃণমূল ভয় দেখাতে রাতের অন্ধকারে কেড়ে নিয়েছিল গরীব মহিলাদের ইজ্জত, প্রতিবাদ করতে গেলে যে অসহায় হিন্দু-দলিতদের খুন করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে তৃণমূলের বাঘ শাহজাহান বা বীরভূমের বীর অনুব্রত, যাদের সন্ত্রাসে অসংখ্য বিজেপি পরিবারের মা-বোনেরা স্বামী-সন্তানহারা হয়েছে – তাদের জন্য কি কেউ নেই? আছে। যিনি অকুতোভয় উচ্চারণে বলতে পারেন, বাংলার জন্য আমার পাঁচ গ্যারান্টি। এক, প্রাণ থাকতে আমি ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হতে দেবনা। দুই, এসসি-এসটি-ওবিসিদের সংরক্ষণ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তিন, রামনবমী পালনে আপনাকে কেউ বাঁধা দিতে পারবে না। চার, রাম মন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কেউ বদলাতে পারবে না। পাঁচ, সিএএ আইনকে কেউ আটকাতে পারবে না। এবং সবশেষে যিনি শান্ত গলায় বলতে পারেন, সন্দেশখালিতে যারা অন্যায় করেছে তাদের কাউকে ছেড়ে দেবনা। তিনি নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। রুদ্রযোগী গেরুয়া ঝড়ের সঙ্কল্প বাহক। জয়তু নরেন্দ্র মোদী।

জয় কালভৈরবের জয়।

প্রাণ থাকতে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হতে দেব না

এটাই মোদীর গ্যারান্টি

জয়ন্ত গুহ

স্বাধীনতার এত বছর বাদে দেশ যখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠার পথে তখন ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সংরক্ষণের ডাক দিয়ে জিন্নার মুসলিম লিগের পথে আবারও পা মেলাল যে কংগ্রেস সেই তাঁদের এবং নীরব জোট শরিকদের কি ক্ষমা করবে ভারতবর্ষের জনসাধারণ?

২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে কারা জিতবে বা কারা সরকার গঠন করবে সেটা নির্বাচন ঘোষণার বহু আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ২০২৩-এর মার্চে ভারতীয় জনতা পার্টি যখন ২০২৪-কে সামনে রেখে ২০২৯ সালের রোডম্যাপ তৈরি করছিল তখন কার্যত হাফপ্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে থাকা বিরোধী জোটের বালকবালিকা বৃন্দ ঘুরপাক খাচ্ছিল ২০১৮ সালে। সেই মার্চ মাস যখন কংগ্রেসের 'শাহজাদা' বিদেশ থেকে দেশে ফিরলেন, সংসদে শুরু হল চরম বিশৃঙ্খলা, আদানি নিয়ে বিরোধীরা দাবী তুললো যৌথ সংসদীয় কমিটির, কলকাতায় আখিলেশ-মমতা বৈঠক, বৈঠকে বিজেপি বিরোধী জোট গঠনের ডাক, উড়িষ্যায় গিয়ে নবীনের সঙ্গে মমতার সাক্ষাৎ এবং ততক্ষণে সবার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে দেশের কথা ভেবে সংসদে যা আলোচনা হওয়া উচিৎ। ফলে ২০১৮-র পুরনো মদ নতুন বোতলে ভরে বিরোধীদের স্লোগান হল 'মোদীকে হারাতে হবে' (বিজেপি নয়)। হাস্যকর সেই স্লোগানকে সামনে রেখে ইন্ডি জোটের পিণ্ডি চটকে মমতা-রাহুল-লালু-ইয়েচুরিরা পাশাপাশি জোট বৈঠকে বসলো কিন্তু ২০২৪ নির্বাচন ঘোষণার আগেই জোট ভেঙ্গে ভোকাট্টা। ভারতীয় জনতা পার্টি যখন দেশের উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে এবং ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে – এবার ৪০০ পার –এর ডাক দিচ্ছে তখন দিশাহীন বিরোধী জোটের হাতে পেন্সিল, সামনে নেই কোনও নির্বাচনী ইস্যু। ফলে সহজ নোংরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথে নামতে হল তাদের। সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন তৈরি করতে প্রথমে রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান বয়কট এবং পরবর্তী কালে ইন্ডি জোটের জ্যাঠা কংগ্রেসের, ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সংরক্ষণের ডাক। স্বাধীনতার এত বছর বাদে দেশ যখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠার পথে তখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনে জিন্নার মুসলিম লিগের পথে আবারও পা মেলাল যে কংগ্রেস সেই তাঁদের এবং নীরব জোট শরিকদের কি ক্ষমা করবে ভারতবর্ষের জনসাধারণ?

কংগ্রেস তার ইশতেহারে সম্পত্তির বন্টন এবং সম্পদের উপর অধিকার নিয়ে কৌশলে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংককে খুশী করতে যে বিষাক্ত চাল চেলেছিল তা আসলে কি তা ইতিমধ্যেই সবাই জেনে ফেলেছেন এবং যারা জানেন না তাঁদের জন্য খুব সহজভাবে তা বারেবারে ব্যাখ্যা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর নির্বাচনী ভাষণ এবং অজস্র সাক্ষাৎকারে। তৃতীয় দফা ভোটের আগে বিজেপি প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করে দেন কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক ইশতেহার নিয়ে। "প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। তফসিলি জাতি-জনজাতি এবং ওবিসিদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মুসলিমদের সংরক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনাই কংগ্রেস এবং 'ইন্ডি' (ইন্ডিয়া) জোটের রাজনীতি," প্রধানমন্ত্রীর এই সতর্কবার্তার সঙ্গেসঙ্গেই শুরু হয় কংগ্রেসের কুকীর্তি ধামাচাপা দেওয়া এবং মিডিয়াকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর লাগাতার আক্রমণে তাঁদের সে চেষ্টা বিফলে যায় এবং নরেন্দ্র মোদীর জন্যই সংবাদমাধ্যম প্রথম বুঝতে পারে আসলে শব্দের খেলায় কংগ্রেস তার ইশতেহারে মেরুকরণের রাজনীতি করছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি অতিচালাক বিরোধীরা এবং কংগ্রেসের পোঁ ধরা আনন্দের-বাজার নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধেই বলতে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নাকি মুসলিম-পাকিস্তান-মঙ্গলসূত্রের কথা বলে মেরুকরণের রাজনীতি করেছে। এটা অনেকটা (নরেন্দ্র মোদীর কথায়) ধরুন ৪/৫ জন বসে আছে।

তাঁদের মধ্যে একজন আপনার পকেট থেকে টাকা তুলে নিয়ে পকেটমার হয়েছে বলে শোরগোল তুলে পকেটমার ধরতে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কংগ্রেস সেই পকেটমার। এক্ষেত্রে ধরা পড়েছে হাতেনাতে।

কংগ্রেসের ইশতেহারে যদি সাম্প্রদায়িক প্রতিশ্রুতি ভয়ানক ভাবে জায়গা করে নেয় এবং সীমান্তপার থেকে কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়ে প্রশংসা করা হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠা তো স্বাভাবিক। কংগ্রেসের ইশতেহারে ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণের প্রস্তাব যা সংবিধানের ভাবনার সঙ্গে খাপ খায় না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি খুব ভুল করেছেন? নরেন্দ্র মোদী সাফসাফ বলেছেন, কংগ্রেসের এই সংরক্ষণের প্রস্তাব আসলে এক সুপরিকল্পিত কৌশল, যা তারা রাজ্য স্তরে কয়েক দশক ধরে প্রয়োগ করে এসেছে। ১৯৯৫ সালে কর্নাটকে কংগ্রেস ওবিসিদের সংরক্ষণের একাংশ মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ করেছিল। এর পরে ২০০৪ সালে কংগ্রেস অন্ধ্রপ্রদেশে তফসিলি জাতি, জনজাতি ও ওবিসিদের সংরক্ষণ থেকে মুসলিমদের সংরক্ষণ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সফল হয়নি আদালতে সেই উদ্যোগ আটকে যাওয়ায়। কংগ্রেসের ২০০৯ সালের ইশতেহারেও এই মনোভাব একেবারে স্পষ্ট ছিল। কংগ্রেস জাতীয় স্তরে ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ চালু করতে চেয়েছিল - এই তথ্য কি অস্বীকার করতে পারবে কংগ্রেস ও বিরোধী জোট? দেশের তফসিলি জাতি, জনজাতি ও ওবিসিদের নিয়ে এই ভয়ঙ্কর খেলা কংগ্রেস শুরু করেছে অনেকদিন আগে থেকেই এবং সব জেনেশুনেও মমতা-ইয়েচুরি-স্ট্যালিনরা নীরবে কংগ্রেসকে সমর্থন দিল কিভাবে? তারাও কি তলায় তলায় তামিলনাড়ু বা বাংলায় কংগ্রেসের কর্নাটক মডেল চালু করতে চায়? ক্ষমতায় এসে কর্নাটকে রাতারাতি কংগ্রেস গোটা মুসলিম সমাজকে ওবিসি বলে ঘোষণা করে দেয়। যা ওবিসিদের অধিকারের প্রকাশ্য লুট এবং অবশ্যই সংবিধান বিরোধী।

কংগ্রেস কি জবাব দিতে পারবে কেন গান্ধী পরিবারের 'শাহজাদা'র প্রধান পরামর্শদাতা স্যাম (পিত্রোদা) কাকু বিদেশ থেকে কংগ্রেসের ইশতেহার সমর্থন করে বলেছেন, "আমেরিকায় একজন মানুষের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির ৪৫ শতাংশ চলে যায় তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, আর ৫৫ শতাংশ সম্পত্তি সরকার নিজের কাছে রাখে। ভারতে এমনটা হয় না"। এখানেই তো পরিষ্কার হয়ে যায় ইশতেহারে কায়দা করে বলা কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্য। এবং তখন যদি প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতে উত্তরাধিকার আইনটি সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বাতিল করেছিলেন। রাজীব গান্ধী এই আইনটি বাতিল করেছেন যাতে তার পরিবার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়," – তাহলে তিনি কি খুব ভুল বলেছেন? ইশতেহারে

সম্পদ বন্টন করে দেওয়ার যে প্রস্তাব কংগ্রেস রেখেছে, তার বিরুদ্ধে দেশের মানুষের স্বার্থে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তার সরাসরি প্রশ্ন, "কংগ্রেসের শাহজাদা আমজনতার সম্পদের এক্স-রে করতে চাইছেন? এ দেশে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সম্পদ গচ্ছিত রাখার প্রথা রয়েছে। এখন কংগ্রেসের নজর সেই মা-বোনেদের সম্পদের উপরে গিয়ে পড়েছে? যদি আপনার পরিবার বাড়তে থাকে এবং আপনার যদি গ্রামে একটি বাড়ি ও যে শহরে আপনার কর্মস্থল সেখানে আর একটি বাড়ি থাকে, তা হলে কংগ্রেস একটি বাড়ি কেড়ে নিয়ে তা তার সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ককে বিলিয়ে দেবে? এটাই তো আসলে কংগ্রেস বলতে চাইছে তাদের ইশতেহারে"। দেশের সাধারণ মানুষ, সাধারণ ভোটারদের কথা ভেবে প্রধানমন্ত্রী কি কিছু ভুল বলেছেন? কারা মেরুকরণের রাজনীতি করছে? বিরোধী জোট না ভারতীয় জনতা পার্টি? পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রীরা কেন ভারতে কংগ্রেসের সমর্থনে মুখ খোলে? কাদের স্বার্থরক্ষা করতে চায় শাহজাদা? কেন কংগ্রেসের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসী হামলার জন্য পাকিস্তানকে ক্লিনচিট দেয় এবং ভারতীয় সেনার দিকেই আঙ্গুল তোলেন? রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর থেকে কেন ভারতীয় সেনার প্রতি কংগ্রেসের এত ঘৃণা? কেন ২৬/১১ মুম্বই হামলায় পুলিশের মৃত্যুর জন্য মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের এক নেতা হিন্দুদের দোষী সাব্যস্ত করে পাকিস্তানকে ক্লিনচিট দেয়? ভাবতেও অবাক লাগে যখন 'ইন্ডিয়া' জোটে কংগ্রেসের এক অন্যতম শরিক দলের নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, পাকিস্তান চুড়ি পরে বসে নেই! ছিঃ ছিঃ। এই তাহলে কংগ্রেসের দেশপ্রেম? আর এরপর যদি নরেন্দ্র মোদী প্রশ্ন করেন, "আমি শাহজাদার কাছে জানতে চাই কেন পাকিস্তানের প্রতি এত ভালবাসা আর দেশের সেনার প্রতি ঘৃণা"? – তাহলে কি কোন ভুল করেছেন, অন্যায় করেছেন নরেন্দ্র মোদী? একটা কথা কিন্তু এখানে পরিষ্কার হওয়া দরকার। নরেন্দ্র মোদী কি মুসলিম এবং ইসলাম বিরোধী? যদি তাই হত তাহলে নরেন্দ্র মোদী দেশজুড়ে কেন স্লোগান দিতে যাবেন "সবার সঙ্গে, সবার বিকাশ" – আর সেটা হবে – "সবার বিশ্বাস এবং সবার প্রয়াসে"। এটাই নরেন্দ্র মোদী সরকারের মূল মন্ত্র এবং বিকশিত ভারতের পথ। নরেন্দ্র মোদীর নিজের কথায়, "আমি মুসলমান বা ইসলাম বিরোধী নই। কিন্তু কংগ্রেস সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে দেশে সংবিধান বিরোধী যে আক্রমণ নামিয়ে আনতে চাইছে, তা নিয়ে দেশবাসীকে পরিষ্কার করে আমাকে তো সব বলতেই হবে। সেকুলারিজমকে সামনে রেখে কংগ্রেস সহ বিরোধীজোট বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের স্বার্থে (যা সংবিধান বিরোধী) যখন তাদের নীতি নির্ধারণ করবে তখন তারা সাম্প্রদায়িক নয়। আর মোদী আসল তথ্য সামনে তুলে ধরলেই মোদী সাম্প্রদায়িক"? কোন রকম রাখঢাক না করে সোলাপুরের জনসভায় নরেন্দ্র মোদী পরিষ্কার জানিয়েছেন, "আগামী দিনে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তফসিলি জাতি, জনজাতি, পিছিয়ে থাকা অংশের সংরক্ষণ তুলে সংখ্যালঘুদের দিয়ে দেবে। গত ১০ বছরে দেশে সামাজিক ন্যায়ের জন্য যত কাজ হয়েছে তা স্বাধীনতার পর কখনও হয়নি। ৬০ বছর ক্ষমতায় থেকে কংগ্রেস সরকার দলিত, জনজাতি, তফসিলিদের সমস্ত দাবিকে আটকে রাখার নিরন্তর প্রয়াস করেছে। তাদের দর্শন ছিল, সমাজের এই অংশ এমনই দুর্বল থাক, যাতে তাদেরই আশ্রিত হয়ে থাকে। যখন ভোট দরকার, আদায় করে নিতে সুবিধা হবে।"

দিনের আলোয় নরেন্দ্র মোদী যখন কংগ্রেসের সেকুলারিজমের মুখোশ এক এক করে খুলে দিচ্ছেন তখন মুখরক্ষা করতে কংগ্রেসের শাহজাদা এক হাস্যকর দাবী করে। মোদী নাকি '৪০০ পার'-এর ডাক দিয়েছেন সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে। সংবিধান সংশোধন করে তিনি নাকি তফসিলি জাতি, জনজাতি, ওবিসি-র জন্য সংরক্ষণই তুলে দিতে চান। গান্ধী পরিবারের 'শাহজাদা' বোধহয় ভুলে গিয়েছিল ক্ষমতায় আসার পর এনডিএ সরকার দলিত পুত্রকে রাষ্ট্রপতি করেছে। ২০১৯ সালে জনজাতির প্রতিনিধি এক নারীকে রাষ্ট্রপতি করেছে যা স্বাধীনতার পর কখনও হয়নি। শাহজাদা ভুলে গিয়েছে যে মোদী মন্ত্রিসভার ৬০ শতাংশ মানুষ দলিত-জনজাতি বর্গের। তফসিলি জাতি, জনজাতি ওবিসি বিধায়ক-সাংসদদের সংখ্যা বিজেপি-তে সবচেয়ে বেশি।

স্বভাবতই মিথ্যাবাদী ইন্ডি জোটের নির্বোধ বালক 'শাহজাদা'-র

কুযুক্তিকে স্ট্রেটব্যাটে খেলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তার কথায়, "দলিত জনজাতি ওবিসিভুক্ত মানুষ তাদের (কংগ্রেসের) হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে আরও বেশি করে বিজেপি-র সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আর সেটা দেখেই কংগ্রেস চেষ্টা করছে তাঁদের সংরক্ষণ লুট করে সংখ্যালঘুদের হাতে দিয়ে দিতে। আমাদের সংবিধান সমস্ত সংখ্যালঘুর সম্পত্তি রক্ষা করে। এবার কংগ্রেস যখন সম্পদের পুনর্বন্টনের কথা বলছে তখন তারা তো সংখ্যালঘুদের সম্পত্তিতে কোনওভাবেই হাত দিতে পারবে না। ওয়াকফের সম্পত্তির পুনর্বন্টন তো আর করতে পারবে না। অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সম্পত্তির দিকে হাত বাড়াবে। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে দেশের।' কংগ্রেসের মিথ্যা প্রচার এবং কুযুক্তির জবাবে প্রধানমন্ত্রীর উত্তরকে কি সাম্প্রদায়িক বলা যাবে? বিচার করবে দেশের জনতা জনার্দন।

বিজেপি নয়, আজ যদি একজন সাধারণ নাগরিক প্রশ্ন করে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে কংগ্রেসের আপত্তি কোথায়? কেন কংগ্রেস তার ইশতেহারে মুসলিম পার্সোনাল ল –কে ফিরিয়ে আনার কথা বলেছে? এটাই তো চেয়েছিল মুসলিম লিগ। কেন তিন তালাকের মত জঘন্য প্রথাকে ফিরিয়ে আনতে চায় কংগ্রেসের ইশতেহার? কি চায় কংগ্রেস? দেশ কি ধর্মের ভিত্তিতে শরিয়া আইনে চলবে না অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে চলবে? কাদের স্বার্থে কংগ্রেসের 'ন্যায় পত্র'? বিবিধের মাঝে ভারতের একতার স্বার্থে নাকি জিন্নার মুসলিম লিগের স্বার্থে? ওবিসিভুক্ত কোনও সম্মানীয় নাগরিক যদি কংগ্রেসকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা ভাই তোমরা এখন জাতিগণনার দাবী করছ। ওবিসি-দের জন্য তোমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। তো এতদিন ক্ষমতায় থাকাকালীন তোমরা করনি কেন জাতিগণনা? মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কেন সংসদে আড়াই ঘন্টা ধরে ভাষণ দিয়ে বিরোধিতা করেছিলেন রাজীব গান্ধী? কেন ওবিসি-দের উন্নয়নের জন্য পেশ করা কাকাসাহেব কালেলকর কমিশনের রিপোর্টকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কংগ্রেস সরকার? আজ সেই কংগ্রেসের শাহজাদা 'ওবিসি প্রীতি'-র কথা বলছে! ২০১৪-র আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ওবিসি-দের জন্য কোন সংরক্ষণ দেয়নি কংগ্রেস, দিয়েছে মোদী সরকার। ওবিসি শব্দটাকে কোনও সাংবিধানিক স্বীকৃতিই দেয়নি কংগ্রেস। দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। ২০১৮ সালে সাংবিধানিক মর্যাদা পেয়েছে এনসিবিসি (ন্যাশনাল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস)। ভারতে যদি কোন

একটি দল ওবিসি বিরোধী হয় তাহলে সেটা কংগ্রেস আর তাদের সঙ্গেই মমতা-স্ট্যালিনের জোট। ওবিসি বর্গকে সম্মান জানাতে কংগ্রেসের জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসার দম আছে মমতা-স্ট্যালিনের? না নেই, কেননা কংগ্রেসের সঙ্গে মমতা-স্ট্যালিন-লালু-ইয়েচুরিদের প্রেম ও বিরোধিতা একটাই কারণে। সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের দখল। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "কংগ্রেস চায় আঞ্চলিক দলগুলির মুসলিম ভোটকে তাদের দখলে নিয়ে আসতে"। আর মমতা-স্ট্যালিনরা চায় জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের পাশে থেকে নিজের নিজের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ককে দখলে রাখা। বাকীটা অভিনয় এবং মিথ্যাচার।

এমন একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "প্রাণ থাকতে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষন হতে দেবনা"। এমন কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা এই প্রথম নয়, গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন। এবং দুই ক্ষেত্রেই প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করেছেন সংবিধানকে রক্ষা করার কথা মাথায় রেখে। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন, "সংবিধান রচনার সময় আম্বেদকর, রাজেন্দ্র (প্রসাদ) বাবু, নেহরু এবং সব সম্প্রদায়ের মানুষ বসে ঠিক করেছিল – ভারতের মত দেশে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেশের ক্ষতি করবে। কিন্তু দলিত এবং জনজাতির জন্য সংরক্ষণ আবশ্যিক করা হয়েছিল তাঁদের ওপর কয়েকশো বছর ধরে হওয়া সামাজিক নিপীড়নের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য···আর আজ দাঁড়িয়ে কংগ্রেস বলছে ঠিকাদারিতেও সংরক্ষণ দেওয়া হবে এবং সেটা ধর্মের ভিত্তিতে! এটা প্রাণ থাকতে আমি হতে দেব না। কিন্তু কোন মুসলমান গরীব হলে নিশ্চয়ই সে সংরক্ষণের দাবীদার। মুসলমানদের সংরক্ষণের বিরোধী নই আমি কিন্তু সংবিধানকে রক্ষা করতে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ কিছুতেই হতে দেব না"।

দলিত জনজাতি ওবিসি বিরোধী এবং সংবিধান বিরোধী কংগ্রেসের দোসর মমতার বাংলাতে, প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "সতর্ক হতে হবে সবাইকে। অনগ্রসর শ্রেণির যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা তা ছিনিয়ে নিতে চায় তৃণমূল-সহ ইন্ডি জোটের শরিকরা। তোষণের জন্য এসটি, এসসি সংরক্ষণও ছিনিয়ে নিতে চায় তৃণমূল। বিরোধিতা করে সিএএ-এর মত মানবিক আইন এবং রামনবমীর। এরাজ্যের নমঃশূদ্রদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে এরা"। দেশের স্বার্থে তৃণমূলের মত এমন একটি স্বার্থপর দলকে উচিৎ শিক্ষা দিতে প্রয়োগ করুন আপনার শক্তিশালী ভোটাধিকার। গোটা দেশ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিকশিত বাংলার প্রতীক্ষায়।

কর্মসংস্থান না হলে

কীভাবে ৫৫,০০০ কিমি হাইওয়ে নির্মাণ হল ভারতে?

কংগ্রেস বলবে, বিজেপি করবে

/BJP4Bengal bjpbengal.org

শিক্ষা নিয়ে তৃণমূলের জোচ্চুরি

স্কুলে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের চাকরি নিয়ে তৃণমূলের জঘন্য খেলা

পুলক নারায়ণ ধর

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন যা কিছু হয়েছে তা এসএসসি-র পরামর্শে হয়েছে। মন্ত্রিসভা শুধু তা অনুমোদন করেছে। অর্থাৎ এই অবস্থায় সমস্ত দায় এসএসসি-র ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তৃণমূলকে কোনোভাবেই এই পাপ থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ২০০১ সালে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী চৌতালাকেও এই একই অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতের নির্দেশে ১০ বছর জেল খাটতে হয়েছিল।

একদা বাঙালির অতি গর্বের বস্তু ছিল শিক্ষা। আজ তা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ। অতি মূর্খ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা ভয়ংকর ভাবে বিপর্যস্ত। এই অবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল কিন্তু সিপিএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্টের রাজত্বে। বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শন ও দলীয় আধিপত্যবাদ ১৯৭৭ সাল থেকেই 'বুর্জোয়া' শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে প্রগতিশীল শিক্ষার বিষবৃক্ষ রোপণ করার ব্রত গ্রহণ করেছিল।

প্রথমেই তাঁরা সব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে নজর দিয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাঁরা মনে করত এলিট ক্লাসের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করা বা খর্ব করার অর্থ হচ্ছে এলিট ক্লাসের উপরে আক্রমণ। এটা শিক্ষা ব্যাবস্থায় বিপ্লব ঘটাবে। এই আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁরা প্রথমেই বেছে নিল কলকাতার বিশিষ্ট কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজকে। এই কলেজের বিশ্বজোড়া খ্যাতি সিপিএমের কাছে সহ্য হচ্ছিল না। কারণ এই কলেজ থেকেই শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়ারা উৎপন্ন হয়। এরকমই তাঁদের ধারণা ছিল সুতরাং আগে এই শিক্ষার বাস্তিল দুর্গে আক্রমণ কর। এই ব্রত নিয়ে তাঁরা সবচেয়ে সহজ যে কাজ শুরু করল, তা হল এই কলেজ থেকে বিশিষ্ট শিক্ষকরা যারা বহুদিন ধরে এখানে পড়াচ্ছেন এবং অন্যান্য যারা এই কলেজের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ তাঁদের পাইকারি হারে বদলি করা। এই সুযোগে বহু কমা বা অক্ষম দলবাজ শিক্ষককে প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি করে আনা হোল। এই ভাবে কলেজের সর্বনাশ ঘটান হোল। সরকারি সমস্ত কলেজে দলবাজি করে তাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিল। এর পর এল ভাষা শিক্ষা নিয়ে এক কেলেঙ্কারি। স্কুল শিক্ষা বা বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় গুলি ধ্বংস হোল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও দলের নাগপাশে ওষ্ঠাগত হল। এই ভাবে বামেরা যে নষ্ট শিক্ষার প্রবর্তন করল এবং ৩৪ বছর ধরে তা টেনে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ করল সেই ট্র্যাডিশন মমতা সরকার জোর কদমে বহন করে চলেছে।

গত ২২ এপ্রিল মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালতের একটি রায়ে সরকার ও এসএসসি বেসামাল হয়ে পড়েছে। বিচারপতি বসাক এবং বিচারপতি মোঃ সবুর ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে, ২০১৬ সালে এসএসসির হাত ধরে নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষক পদে এবং গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি চাকরি বাতিল করা হয়েছে। এই সংখ্যাটি ২৫, ৭৫৩। সারাদেশে শিক্ষা নিয়ে এত বড় scam বা দুর্নীতি কোনকালেই ঘটেনি। আদালত এ বিষয়ে ১৭ টি দৃষ্টান্তমূলক বেনিয়ম এর উল্লেখ করেছে। এসএসসি-এর চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন যে প্রায় ২৬,০০০ চাকরিরতদের মধ্যে ৮০০০ অবৈধ নিয়োগ। এরা অন্য পদ্ধতিতে (অর্থাৎ ঘুষ দিয়ে) চাকরি লাভ করেছে। তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে এই পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিট নষ্ট হয়ে গেছে বা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এমনকি ইন্টারভিউতেও অনেক কারচুপি হয়েছে সুতরাং এই ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের মধ্যে কারা যোগ্য এবং কারা অযোগ্য এটা নির্ধারণ করা অসম্ভব। এটা তিনিই জানিয়েছিলেন কলকাতা মহামান্য

হাইকোর্টের বিচারপতিদের। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কলকাতা উচ্চ আদালতের রায় গোটা সন্দেহজনক তালিকা বাতিল করে দিয়েছে। এছাড়া উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের অন্য কোন উপায় ছিল না।

নির্লজ্জ রাজ্য সরকার ও তাঁর নির্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রী ঘুষ দিয়ে চাকরি প্রাপকদের জন্য সুপারনিউমারি পদ সৃষ্টি করলেন অর্থাৎ অযোগ্য এবং যোগ্য সকলেই বহাল থাকুক। এমন অদ্ভুত ফর্মুলা গ্রহণ করল মন্ত্রিসভা! এতো চোর বাঁচাও ফর্মুলা। একবারের জন্যও মুখ্যমন্ত্রী এটা ভাবলেন না যে এই ব্যবস্থায় স্কুলের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ কোন অন্ধকার গহ্বরে ফেলে দিলেন। বাস্তবে এর দায় গোটা মন্ত্রিসভা এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিজের। কারণ এই নীতিহীন গর্হিত কাজ তাঁরই সৃষ্টি এবং তার দায় তাকেই বহন করতে হবে।

কিছুদিন আগে কোন একটি সভায় শিক্ষামন্ত্রীকে প্রকাশ্যে বলতে শোনা গিয়েছিল যে তৃণমূল করলেই চাকরি পাওয়া যাবে। দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূল যা বলে তাই করে দেখায় এই কথা তো তৃণমূলের মোড়ল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব জোর গলায় গর্ব করে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছেন। এতে পশ্চিমবঙ্গের যে ক্ষতি হচ্ছে বা পশ্চিমবঙ্গ যে রসাতলে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে সে ব্যাপারে তাদের কোন চিন্তা নেই। তাতে অবশ্য ওদের কিছু এসে যায় না।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে এটাও বলা হয়েছে যে কে কিভাবে এই সুপারনিউমারি পদের সৃষ্টি করার সুপারিশ করেছেন। এবং মন্ত্রিসভাই বা কিভাবে এই সুপারিশ অনুমোদন করেছেন সে বিষয়ে সিবিআই তদন্ত করবে। প্রয়োজন হলে সিবিআই যে কোন ব্যক্তিকে অর্থাৎ মন্ত্রী বা আমলাকে তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন। এর পরেই সমস্ত মন্ত্রিসভা এবং মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের প্রধান মোড়লের ঘুম ছুটে গেছে। হাইকোর্টের এই রায়ে তৃণমূল দলের অভ্যন্তরে ভয়-ভীতি ঢুকে গেছে। তাঁরা তড়িঘড়ি এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিদের চাকরি বহাল রাখার ব্যাপারে আর তাদের মাথাব্যথা নেই। তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছে গোটা মন্ত্রিসভাকে বাঁচাতে। চোরের মাথা ধরা পড়ার মুখে তাই তাঁরা চলে গেছেন দিল্লিতে বাঘা বাঘা উকিল ধরে (জনগণের পয়সায় অবশ্যই) নিজেদের জেলের গরাদের বাইরে রাখতে।

সুপ্রিম কোর্টের মুখ্য বিচারপতি এই রায় ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে তার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে যা বলেছেন তা মারাত্মক এবং রাজ্যের পক্ষে তা আদৌ সম্মানজনক নয়। এরপর হয়তো প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধেই মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর প্রধান মোড়ল এবং চন্দ্র তারকারাও অভিযোগ তুলবেন যে প্রধান বিচারপতি পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করছেন।

আশ্চর্য এই যে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে এসএসসির চেয়ারম্যান হাইকোর্টে যা বলেছেন তার উল্টো কথা বলছেন। তিনি হাইকোর্টে বলেছিলেন যোগ্য অযোগ্যদের তালিকা নির্মাণ করা বা বাছাই করা খুবই অসম্ভব। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে তিনি জানিয়েছেন যে যোগ্যদের তালিকা তিনি তৈরি করে জানাবেন। খুবই ভালো কথা। কিন্তু এই তথাকথিত যোগ্যদের মধ্যে আরো কত অযোগ্য আছেন সেটা জানবেন কি করে? এইখানে আরেকটি প্রশ্ন আছে যদি এসএসসি বা সরকার প্রথমেই হাইকোর্টকে জানাতেন যে বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়া ৮ হাজার শিক্ষকের পদ বাতিল করলাম তাহলে বিষয়টি এই পর্যন্ত আসতো না। আসলে তাঁরা কাল হরণ করার জন্যই এই নষ্ট পন্থা বেছে নিয়েছেন। এখনো তাই সুপ্রিম কোর্টকে তাঁরা যখন বলছে অযোগ্য যোগ্য ভাগ করতে পারবেন বা বাছাই করতে পারবেন তার মানে তাঁরা এই ক্ষেত্রে আরো সময় চেয়ে নেবেন। এবং আরো বেশ কিছুদিন ধরে বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রাখবেন। সেটা আইন বিশেষজ্ঞরা বুঝবেন। কিন্তু রাজনীতিতে এর ফল তৃণমূলের পক্ষে সাময়িকভাবে গেলেও তৃণমূলকে তা বাঁচাতে পারবে না। তার চেয়ে বড় কথা তৃণমূল বাঁচলো কি না তার চেয়েও বড় কথা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি আরও দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার যে ১৯৯৩ সালে বামফ্রন্টের শাসনকালে এইরকম বেআইনি নিয়োগের ঘটনা ঘটেছিল। ২২০০ ব্যক্তির চাকরি এর ফলে হাইকোর্টের রায়ে চলে গিয়েছিল। সে সময় কিন্তু সিপিএম পার্টি বা সরকার এ নিয়ে খুব একটা হইচই করেনি কারণ তাঁরা জানতেন যে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং অনেক দিন পর্যন্ত এসব নিয়ে কাগজপত্রে লেখালেখি হবে এবং জনগণ আরো বেশি বেশি করে এ বিষয়ে জানতে থাকবে। তাই তাঁরা চুপচাপ ছিল। ত্রিপুরাতেও সিপিএম শাসনকালে প্রায় দশ হাজার জনের চাকরি বাতিল হয়েছিল কোর্টের আদেশে। সুতরাং তৃণমূলকে এই কথা মনে রাখতে হবে যে তাদেরও কিন্তু কোনোভাবেই এই পাপ থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ২০০১ সালে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী চৌতালাকেও এই একই অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতের নির্দেশে ১০ বছর জেল খাটতে হয়েছিল।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন যা কিছু হয়েছে তা এসএসসির পরামর্শে হয়েছে। মন্ত্রিসভা শুধু তা অনুমোদন করেছে। অর্থাৎ এই অবস্থায় সমস্ত দায় এসএসসির ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। অর্থাৎ বলির পাঁঠা খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মন্ত্রিসভা-মুখ্যমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রী তাদের দায় ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। কোন আইনেই পারেন না। তাই তাদের এখন খুঁজতে হচ্ছে বাঁচার পথ এবং তা ভুল পথে। এটা লক্ষনীয় এসএসসি-এর চেয়ারম্যান এতকাল বলে আসছিলেন যে যারা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছেন তাদের জন্য এবং কারুর জন্যই তাদের কিছু করার নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গে এসে এক নির্বাচনী সভায় তাঁর ভাষণে যখন বললেন যে তিনি বঞ্চিতদের জন্য এবং যোগ্য প্রার্থীদের জন্য আইনজ্ঞদের একটি সেল গঠন করবেন তখন চেয়ারম্যান ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে জানালেন যে সরকার এদের জন্য চেষ্টা করবে। কারণ তাঁরা বুঝে গেছেন যে পালের হাওয়া প্রধানমন্ত্রী কেড়ে নিচ্ছেন। একেকবার একেক রকম কথা তৃণমূল দল এবং তার তাঁবেদাররা বলে যাচ্ছেন। এতে সত্যিকারের চাকরিহারাদের মধ্যে বা যারা বঞ্চিত হয়ে পথে বসে আছেন তাদের কারুর মনেই কোন আশার সঞ্চার করেনি। আসলে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে তাঁরা শুধু মন্ত্রীদের বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন এবং প্রধান মোড়লকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। অন্যদের নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই।

শিক্ষাই সারা ভারতবর্ষে বাঙালির এবং পশ্চিমবঙ্গের বহুকাল গর্বের বিষয় ছিল। সিপিএমের সময় থেকেই তা নামতে শুরু করেছে। এবং তৃণমূল এই বিষয়টিকে অসৎ উপায়ে টাকা রোজগারের বা তোলাবাজির ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সহ সমস্ত শিক্ষা বিভাগ আজ ফাটকের ভেতরে। বাকিরা একই পথ অনুসরণ করেছে। তাদেরও গতিপথ সেখানেই। জেলের বিন্দুতেই এদের তৃণশয্যা।

সে মূলেই তাঁরা ফিরে যাবে।

সন্দেশখালির জনগর্জন

বাড়ুজ্জ্যে জমিদারির শেষের শুরু

বিনয়ভূষণ দাশ

সন্দেশখালির মা দুর্গাদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র ছিলনা, ছিল লাঠি আর ঝাঁটা। সন্দেশখালির মা-বোনেদের পয়সা ছিলনা তৃণমূলের 'তালপাতার' সেনাপতির মত, ছিল শুধু মান-সম্মানের বোধ। শুধুমাত্র লাঠি-ঝাঁটা নিয়ে মা দুর্গারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তৃণমূলের শাহজাহান বাহিনীর খুন, শারীরিক নিগ্রহ এবং হিন্দু দলিতদের জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে। আর এমনই তেজ সেই প্রতিবাদের যে হালুম হুলুম করা 'পিসি-ভাইপো'-র সন্দেশখালি যাওয়ার মুরোদ নেই, ভিডিও বানিয়ে দাপাদাপি শুধু ফেসবুক-টুইটার-এ।

সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা হল সন্দেশখালিতে ঘটে যাওয়া 'এপিসোড'। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালিতে রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস দলের স্থানীয় কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে নারীদের উপর যৌন নির্যাতন, পুরুষদের উপর শারীরিক নির্যাতন, জমি দখলের মত অভিযোগগুলি নিয়ে সেখানকার জনগণ ক্ষিপ্ত। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগগুলি তাঁরা করে এলেও কোন সুরাহা তাঁরা পাচ্ছিলেন না। ফলে একসময়ে তাঁদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। অত্যাচারিত স্থানীয় নারীরা এক সময় প্রবল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আর এই বিক্ষোভ এক সময় চরমে পৌঁছায়। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি নারী নির্যাতন ও অবৈধ জমি দখলের বিষয়টিকে জাতীয়স্তরে নিয়ে গিয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও সংবাদমাধ্যমে সারাদেশে সন্দেশখালির খবর হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে! বিরোধী দলগুলির, বিশেষ করে বিজেপির বক্তব্য, তারা সারাদেশের মানুষকে দেখাতে চাইছেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্বেও তাঁরই দলের বিভিন্ন স্থানীয় নেতারা লাগাতার নারী নির্যাতন ও অবৈধভাবে স্থানীয় মানুষের জমিজিরেত দখল করে নিচ্ছে। জোর করে তাঁদের চাষের জমি দখল করে সেই জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে মাছের ভেড়িতে রূপান্তরিত করছে শেখ শাহজাহান ও তাঁর দলবলেরা। আর শুধু সন্দেশখালিতেই নয়, সারা রাজ্যেই শাসক তৃণমূল

কংগ্রেসের নেতাদের মদতে অবৈধভাবে শুধু গরীব মানুষের নয়, সরকারী জমিও অবৈধভাবে লুণ্ঠন চলছে ! এ যেন সেই পাঠান-মোঘল রাজত্ব চলছে! বাইরে থেকে আসছে আর গায়ের জোরে সবকিছু দখল করে নিচ্ছে! মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পাড়ে তৃণমূল নেতৃদ্বয়, হোসেন ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রত্যক্ষ মদতে জাতীয় সড়ক -৩৪ বরাবর একর একর জমি অবৈধভাবে দখল করে প্রাচীর দিয়ে দেওয়া হয়েছে; অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নয়ানজুলি! বহরমপুর শহরেরও তথৈবচ অবস্থা! অথচ ভূমি দফতর ও পুলিশ এসব দেখেও চোখ বন্ধ করে আছে।

যাইহোক, সন্দেশখালির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এই পরিপ্রেক্ষিতে উঠে এসেছে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শেখ শাহজাহানের নাম।এই শেখ শাহজাহান সি পি এমের হাতে তৈরি। সি পি এম জামানায় সে প্রকাশ্যে পিস্তল হাতে ঘুরে বেড়াত। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্বে তাঁর বাড়বাড়ন্ত হয়েছে কয়েকগুণ। তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় মহিলা, বিশেষ করে হিন্দু মহিলাদের উপর নানাভাবে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। মহিলাদের রাত দুপুরে ডেকে পাঠাত শাহজাহান ও তাঁর দলবল।এলাকার কয়েকজন নারী পরিচয় গোপন করে সংবাদ সংস্থা এ এন আই কে জানিয়েছেন কিভাবে শাহজাহান ও তাঁর সাগরেদরা তাঁদের উপর যৌন নির্যাতন চালাত।একজন নারী জানিয়েছেন," ওঁরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জোর করে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যেত মাঝরাতে। কারও শরীর খারাপ থাকলেও বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কাজ করাতো,'। অন্য একজন মহিলা এ এন আই কে জানিয়েছেন, "আমরা কি সম্মান ফিরে পাব? আমাদের প্রতিবেশীদের কাছে শুনতে পেতাম মাঝরাতে তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে সকালবেলা ফেরত দিয়ে যেত। রাত বারোটায় নাকি মিটিং ডাকত। "এমনকি নারীদের মারধর করে হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে শাহজাহান শেখের দল।রাতে মেয়েদের ডেকে নিয়ে গিয়ে পিঠে-পুলি বানানো হত আর তাদের যৌন নির্যাতন করা হত। তাঁদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, তাঁরা অবৈধভাবে স্থানীয় গরীব মানুষজনের চাষের জমি দখল করে নিয়েছেন। এই বৎসরের জানুয়ারি মাসের গোঁড়া থেকেই শেখ শাহজাহানের নাম সামনে আসে। ফলে জানুয়ারির শুরুতে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট খাদ্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র দপ্তরের অধীন রেশন দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে শেখ শাহজাহানের বাড়ীতে তল্লাশি চালাতে যায়। কিন্তু শেখ শাহজাহান ও তাঁর দুর্বৃত্তবাহিনী শাসক তৃণমূল দলের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে এতটাই তাঁর বাড়বাড়ন্ত যে, তাঁরা কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডি-র আধিকারিকদের মারধোর করে তাড়িয়ে দেয় শাহজাহান ও তাঁর দলবল।এতটাই তাঁদের স্পর্ধা! আর শাহজাহান নিজে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, সুন্দরবন অঞ্চলের সন্দেশখালি দ্বীপে পৌঁছাতে যে কালিন্দী নদী পেরোতে হয়, সেটা বাংলাদেশ থেকে 'অনুপ্রবেশের' বহুল পরিচিত পথ। সন্দেশখালি যেতে নদীর এপারে যেখান থেকে নৌকায় চড়তে হয় সেই ধামাখালি ঘাটে বেশ কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী বিএসএফের হাতে ধরা পড়েছিলো কয়েক বৎসর আগে। একসঙ্গে তিন নৌকা ভর্তি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছিল সেই সময়।

এসবের প্রতিক্রিয়ায় এলাকার মহিলারা সংঘবদ্ধ হয়ে শেখ শাহজাহান ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে লাঠি-সোটা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাঁরা দাবী করে, দুষ্কৃতিকারী শেখ শাহজাহান ও তাঁর সঙ্গী শিবু হাজরা ও উত্তম সর্দারের গ্রেপ্তারীর । যদিও, শেষোক্ত দুজন সম্পর্কে জনশ্রুতি, তাঁরা বাংলাদেশী মুসলমান, হিন্দু নাম নিয়ে এদেশে আস্তানা গেড়েছে। এই দলবলের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, এঁরা অনেক রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের বাসস্থান ও পুনর্বাসন দিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও রাজ্যের কিছু মন্ত্রীর সক্রিয় সহযোগিতায়। ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়েছে এই অত্যাচার ও জমি দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'জমির আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে সব সময়েই ভোটের সময়ে বড় ইস্যু হয়ে ওঠে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জমি দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। নারীরাই দলে দলে বেরিয়ে এসেছেন তাঁদের উপরে নির্যাতনের কথা বলতে। এখন সেখানে নানা বিরোধী দল যাচ্ছে; কিন্তু শুরুটা শুধুই নারীদের বিক্ষোভ দিয়েই হয়েছে। "সন্দেশখালির মানুষজন, বিশেষ করে মহিলারা কিছুতেই সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাইছেন না এই সঙ্ঘবদ্ধ দুর্বৃত্তদের ভয়ে। কেউ কেউ অবশ্য সাহসে ভর করে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন। এগিয়ে এসেছেন অসম সাহসিনী নারী রেখা পাত্র। তিনি হয়েছেন প্রতিবাদের প্রধান মুখ। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অভিহিত করেছেন 'শক্তিস্বরুপা' বলে।

একজন নারী ওই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সংবাদমাধ্যমে আমাদের মুখ দেখে ফেললেই হামলার ভয় আছে। এর আগে যারা সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলেছে, তাঁদের উপরে হামলা হয়েছে, হুমকি আসছে। 'আরেকজন নারীর কথায়,' মেয়েদের পিঠা-পুলি করতে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের কি নিজেদের মা, বোন নেই বাড়ীতে ? তাঁদের বাড়িতে কি পিঠা-পুলি কেউ করেনা? কেন সুন্দরী-সুন্দরী মা-বোনেদের পিঠে-পুলি করানো হতো?" কখনও পিঠে-পুলির নাম করে, কখনও বা মাংস ভাতের পিকনিকের রান্না করার জন্য, কখনও বা দলের মিটিং আছে বলে ডেকে নেওয়া হত। সেসব ডাক আসার নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না।"

এহ বাহ্য ! সন্দেশখালিতে আরও ভয়ংকর ঘটনা অপেক্ষা করছিল। গত ২৬ এপ্রিল, শুক্রবার সন্দেশখালিতে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই, সিআরপিএফ এবং এনএসজির টিম। তাতে আবিষ্কার হল সন্দেশখালি বাস্তবে বোমা, বারুদ, বিস্ফোরকের এক স্তূপ। সন্দেশখালি যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র।পশ্চিমবঙ্গ আজ এক জতুগৃহে রূপান্তরিত। যেন এক ভয়ংকর যুদ্ধের অপেক্ষায় সমগ্র অঞ্চল। উক্ত তল্লাশিতে উদ্ধার হল বিপুল অস্ত্রের ভাণ্ডার। দেশী-বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্র, প্রচুর কার্তুজসহ অনেক বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ আবু তালেব মোল্লার বাড়ির মেঝে খুঁড়ে । উদ্ধার হয়েছে বিস্ফোরকভর্তি ব্যাগ। আবু তালেবের বাড়ির বারান্দা খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে আরও বহু আগ্নেয়াস্ত্র। এমনকি এই বিস্ফোরক উদ্ধারে এনএসজির 'ক্যালিবার টি-৫' রোবট পর্যন্ত নামাতে হয়েছিল। অবস্থা কতটা ভয়ংকর তা বোঝা যায় ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের হস্তক্ষেপের ঘটনায়। জানা গেছে, ওই বাড়ির মধ্যে রিমোট চালিত রোবট প্রায় পৌনে দু-ঘন্টা ধরে তল্লাশি চালিয়ে বিস্ফোরক ভর্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে। নিয়ে আসা হয়েছিল স্নিফার ডগ ও। এমনকি সন্ত্রাস কবলিত এক সময়ের কাশ্মীরেও এমন ঘটনার কথা শোনা যায়নি। ভোটপর্ব চলাকালে যেভাবে সন্দেশখালিতে এই অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার হল তা ভাববার বিষয়। এ কথা ভাবা অমূলক হবে না যে,চলমান নির্বাচনের সময় রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই অস্ত্র ও বিস্ফোরকের সাহায্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার এক সুপরিকল্পিত প্রয়াস ছিল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং শাসক তৃণমূল দলের। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক সচেতন প্রয়াস শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

উপরোক্ত অস্ত্র শস্ত্রের সাথে উদ্ধার হয়েছে শেখ শাহজাহান সম্পর্কিত একাধিক পরিচয়পত্র ও নথি। শেখ শাহজাহানের নামেই অস্ত্র কেনার রসিদ পাওয়া গেছে। পাওয়া গিয়েছে কিছু আমেরিকান সংস্থার অস্ত্র-শস্ত্র যা ভারতের বাজারে পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে সন্দেশখালির ঘটনায় বিদেশী হাত থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ ঘটনায় রাজ্য, তথা সারা দেশ জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পরের দিন ২৭ তারিখেও সিবিআই ফের হানা দেয় সন্দেশখালিতে। তল্লাশি চালানো হয় শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ তুফান মৃধার বাড়িতেও। তুফানকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। এদিকে শোনা যাচ্ছে, শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগির রাজসাক্ষী হতে চান। এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হলে তৃণমূল কংগ্রেসের দেশ ও রাজ্য বিরোধী চক্রান্তের মুখোশ খুলে যাবে বলে আশা করা যায়।

তো, এসবই চলছিল সন্দেশখালিতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব সব জেনেও উচ্চবাচ্য করেননি। সন্দেশখালিতে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রীর টনক নড়ে। আর কোন সমস্যা সামনে এলেই মুখ্যমন্ত্রী যা করেন, এ ক্ষেত্রেও সেই একই মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। সটান বলে দিলেন, ওই অঞ্চলে আর এস এস আছে আর তাঁরাই এই আছে এই ঘটনার পেছনে ! তবে আর এস এস পদাধিকারী ডঃ জিষ্ণু বসু যথার্থই বলেছেন, "ওখানে যদি সঙ্ঘের খুব শক্তিশালী সংগঠন থাকত তাহলে কি এই অমানবিক কাজ করতে পারত শাহজাহান ও তাঁর বাহিনী?" আর মমতার মতে, সন্দেশখালির ঘটনা নাকি বিজেপির চক্রান্তের ফসল! কিন্তু শুধু অনৃতভাষণেই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোধ করতে পারবেন তাঁর আসন্ন পতন ?

তবে মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত বিষয়টি বাইরের জগতের কাছে লুকোতে চাইছেন তা পরিষ্কার। তিনি কোন দলের প্রতিনিধিকে ওখানে যেতে দিচ্ছেন না। নেতারা সেখানে যেতে চাইলে তাঁদের বাধা দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এক অঘোষিত জরুরী অবস্থা চলছে সন্দেশখালিতে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষকদের মতে, চলমান লোকসভা নির্বাচনে এই ঘটনা প্রভাবিত করবেই। আর এটা যে শুধু নারী ভোটারদের প্রভাবিত করবে তাই নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই ভোট সিদ্ধান্তে এর প্রভাব পড়বেই।আর সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই কাজ করবে।

আর শাসক তৃণমূল কংগ্রেস বিষয়টি ভালভাবেই অনুধাবন করতে পারছে। তাই বিষয়টি প্রশমিত করতে সেখানে দলের নেতাদের পাঠানো হয়েছে।তাঁরা সেখানে ঘন ঘন যাচ্ছেন। ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা আর কি! তবে ভবি কি ভুলবে? তাতে কি খুব একটা লাভ হবে? মনে হয়না ! কারণ নারী নির্যাতন করে কোন শাসকই টিকে থাকতে পারেনি কখনও, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বাড়ুজ্জ্যেও টিকে থাকতে পারবেন না। তাঁর পতন আসন্ন।

গল্প হলেও সত্যি
হীরক রানির
কুকীর্তি

পর্ব – ৬ হীরক রানির চুরিসংহিতা

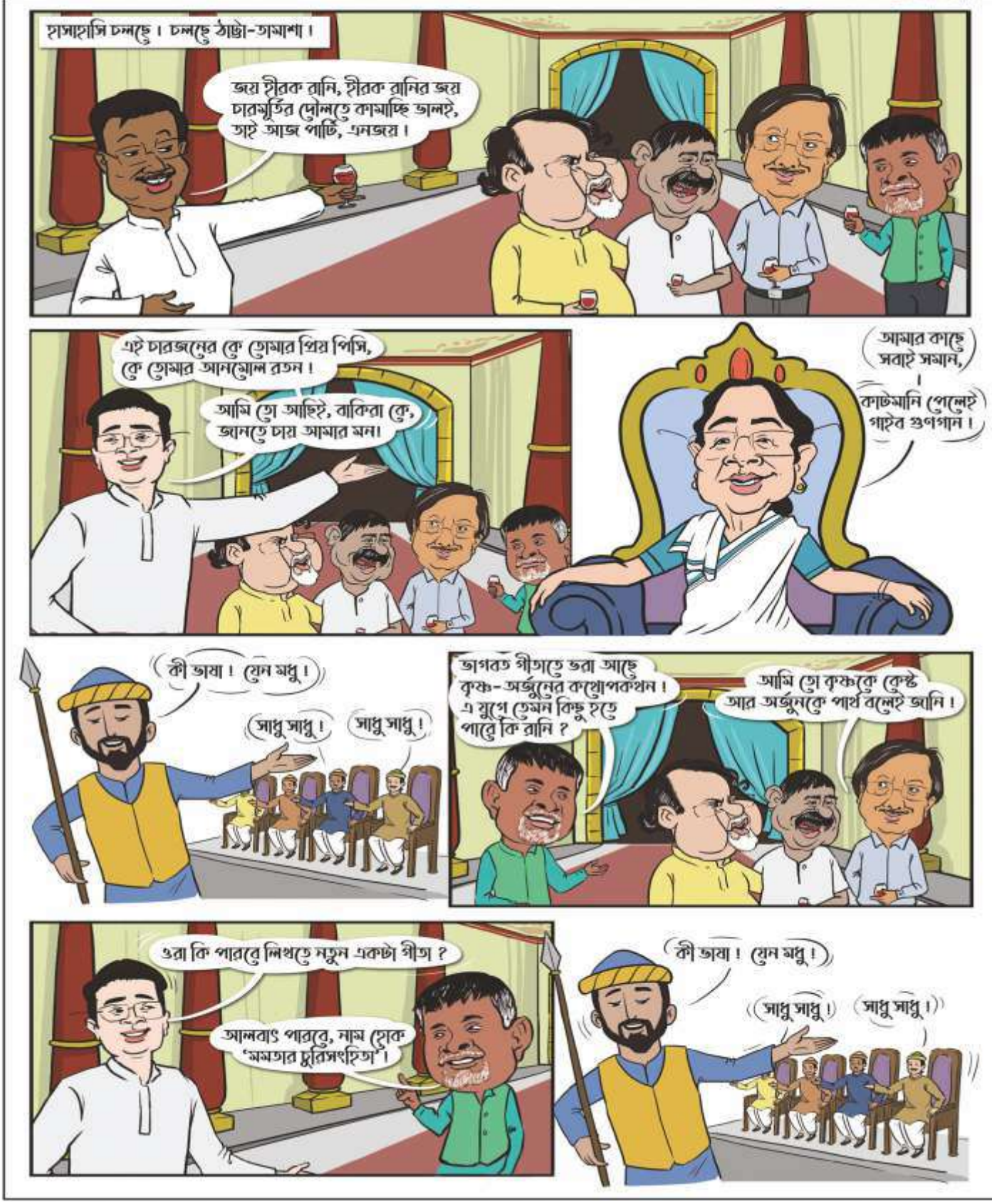

পর্ব – ৬

হীরক রানির চুরিসংহিতা

ছবিতে খবর

ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রী অর্জুন সিং-এর সমর্থনে জগদ্দলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিজয় সংকল্প সভায় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস।

শ্রীরামপুর ও হুগলী লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বসু এবং লকেট চ্যাটার্জির সমর্থনে নরেন্দ্র মোদীর বিজয় সংকল্প সভায় জনজোয়ার।

বর্ধমানের তালিত-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিজয় সংকল্প সভা ভেসে গেল জনস্রোতে।

আসানসোল লোকসভার বিজেপি প্রার্থী এস এস আহলুওয়ালিয়ার সমর্থনে নির্বাচনী রোড শোতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ।

বীরভূম লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে রামপুরহাটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহজি-র বিজয় সকল্প সভায় নারীশক্তির গর্জন।

ছবিতে খবর

কৃষ্ণনগর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিজয় সংকল্প সভায় জনগনের ভালোবাসা-উচ্ছ্বাস বলছে 'এইবার ৪০০ পার'।

বর্ধমান পূর্ব লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার-এর সমর্থনে কাটোয়ায় বিজয় সংকল্প সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল।

আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগরের সমর্থনে পুড়শুড়াতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিজয় সংকল্প সভায় মাতৃশক্তির বাঁধভাঙ্গা সমর্থন।

পুরুলিয়া লোকসভায় বিজেপি প্রার্থী জ্যোর্তিময় সিং মাহাতোর সমর্থনে নির্বাচনী রোড শোতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির বুথ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যোগ্য চাকরিহারাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বললেন বিজেপি যুবমোর্চার রাজ্য সভাপতি ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ।

কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়াম হলে বিজেপি উত্তর কলকাতা জেলার বুথ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন বৈঠকে রাজ্য বিজেপি সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী।

বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ-র সমর্থনে বিষ্ণুপুর লোকসভায় নির্বাচনী প্রচারে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপি কসবা মণ্ডল সভাপতি সরস্বতী সরকারের ওপর তৃণমূলের গুণ্ডাদের আক্রমণের প্রতিবাদে আনন্দপুর পুলিশ স্টেশনের সামনে বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরীর অবস্থান-বিক্ষোভ।

ছবিতে খবর

বীরভূমের আমোদপুর মেলার মাঠে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বিজয় সংকল্প সভায় মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস।

নিউ ব্যারাকপুরে, দমদম লোকসভার বুথ সভাপতি সম্মেলনে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

কলকাতা সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়াম হলে বিজেপি উত্তর কলকাতা জেলার বুথ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ-এর সমর্থনে তিলক ময়দানে বিজয় সংকল্প সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহজী।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পথে শোভাযাত্রায় বারাসাত ও বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার ও রেখা পাত্র, সঙ্গে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মুহূর্তে হুগলী লোকসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি, সঙ্গে উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামী এবং রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মুহূর্তে বাঁকুড়া লোকসভার বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার।

হুমায়ুনের হুঁশিয়ারি

হিন্দুদের ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার তৃণমূলী হুঙ্কার

দিব্যেন্দু দালাল

বাংলায় দাঁড়িয়ে হিন্দুদের হুমকি দেওয়ার অনুপ্রেরণা তো তাঁরা পেয়েছে মমতার কাছ থেকে যিনি সব জেনেও চুপ করে থেকেছেন যখন সন্দেশখালির 'বাঘ' তৃণমূল নেতা শাহজাহানের দলবল দিনের পর দিন হিন্দু মহিলাদের শারীরিক নিগ্রহ করেছে এবং জোর করে হিন্দু দলিতদের জমি কেড়ে নিয়েছে, খুন করেছে এলাকার হিন্দুদের। আসলে নিজেদের অপশাসন, দুর্নীতি, জালিয়াতি ঢাকতে তৃণমূলের এখন শুধু সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের রাস্তাই খোলা আছে।

সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুরে একটি জনসভায় প্রকাশ্যে স্থানীয় হিন্দুদের হুমকি দিয়ে বলেন যে যদি দু'ঘন্টার মধ্যে তিনি এদের ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে না দিতে পারেন তবে রাজনীতি থেকে সরে যাবেন। এর সঙ্গে তিনি জনবিন্যাসের উল্লেখ করে ৭০% ও ৩০% -এর বিভাজনের হিসেব বুঝিয়ে বলেন যে যদি বিজেপির সমর্থকরা ভাবে যে তারা কাজিপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর মুসলিমরা চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, সেটা কোনদিন হবেনা! শুনতে বিস্ময়কর হলেও এই ঘটনা বাংলার সার্বিক পরিস্থিতিকে ব্যক্ত করছে। কিছুদিন আগে গোটা ভারত যখন শান্তিপূর্ণ ভাবে রামনবমী পালন করল তখন বাংলার এই শক্তিপুরে রামনবমীর মিছিল আক্রান্ত হয়। এক মহিলা বোমার আঘাতে গুরুতর ভাবে জখম হন। স্বয়ং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ক্ষুব্ধ হয়ে নির্বাচন কমিশনকে সেখানে নির্বাচন পিছিয়ে দিতে বলেন। তিনি বলেন যে মানুষ যদি কোন উৎসব শান্তিপূর্ণ ভাবে আট ঘন্টার জন্যও পালন না করতে পারে তাহলে সেখানে নির্বাচন করাতে তিনি বারণ করবেন! কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি হলে একথা বলা যায় ভাবুন। যেখানে শাসকদলের বিধায়ক এরকম প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছেন সেখানে এই ধরণের ঘটনা তো বারংবার ঘটবে।

'হিন্দুদের ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার' হুমকি দেওয়ার পর বিজেপি অভিযোগ জানায় নির্বাচন কমিশনে। হুমায়ুনকে শোকজও করে কমিশন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না হুমায়ুন, শাহজাহান বা জাহাঙ্গিরের মত তৃণমূলের রত্নসভার। যে যত বড় চোর, দুর্নীতিগ্রস্ত বা হিন্দুবিরোধী বা সনাতন বিরোধী সে তত বড় তৃণমূল। বাংলায় দাঁড়িয়ে হিন্দুদের হুমকি দেওয়ার অনুপ্রেরণা তো তাঁরা পেয়েছে মমতার কাছ থেকে যিনি জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে গাড়ি থেকে নেমে খিস্তিখেউর দিতে দিতে তাড়া করেছিলেন এক যুবককে। যিনি ভোট ব্যাঙ্কের কথা ভেবে যাননি রাম মন্দির উদ্বোধনে। হুমায়ুনরা নৈরাজ্যের অনুপ্রেরণা পেয়েছে মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকে যিনি কলকাতায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর গাড়ির বনেটের ওপর নেচেছিলেন। মমতাই ওদের অনুপ্রেরণা যিনি সব জেনেও চুপ করে থেকেছেন যখন সন্দেশখালির 'বাঘ' তৃণমূল নেতা শাহজাহানের দলবল দিনের পর দিন হিন্দু মহিলাদের শারীরিক নিগ্রহ করেছে এবং জোর করে হিন্দু-দলিতদের জমি কেড়ে নিয়েছে, খুন করেছে এলাকার হিন্দুদের। আর যখন সব প্রকাশ্যে

এসেছে রেখা পাত্রদের আন্দোলনে তখন তিনি তাঁর ভাইপো 'সেনাপতি পটলা'-কে দিয়ে ২টো ভিডিও করিয়ে মঞ্চে দাপাদাপি করছেন। লাভ নেই। তাঁর দাপাদাপিতে পলকও পড়বে না সন্দেশখালির মা দুর্গাদের। ২টো 'সন্দেহজনক' ভিডিও দিয়ে কি আর শয়ে শয়ে কেস, 'গভীর রাতে তৃণমূল পার্টি অফিসে মহিলাদের নিয়ে গিয়ে পিঠে বানানোর কেস' কি ঢাকা যাবে?

আসল সমস্যা হল, পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল একটি সম্প্রদায়ের ভোট পাওয়ার লোভে ভয়ঙ্কর রকম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের অপশাসন, দুর্নীতি, জালিয়াতি যখন এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে সাধারণ মানুষ এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তখন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের রাস্তাই এদের কাছে একমাত্র খোলা আছে। তাই আগামী দিনে এমন প্রকাশ্য হুমকি আবার এলেও অবাক হব না। অবাক তবে হচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত সুশীল সমাজের এই বিষয়ে উদাসীনতা দেখে। যারা কথায় কথায় বিজেপির ভিনরাজ্যের কোন নেতার বক্তব্যের মধ্যে সম্প্রদায়িক ইঙ্গিত খুঁজে পান আর গলা ফাটান তাঁরা অদ্ভুত রকম নীরবতা পালন করছেন। এঁদের দ্বিচারিতা অবশ্য নতুন নয় বাম আমলের ৩৪ বছর আর এই আমলের ১৩ বছরে মানুষের কাছ থেকে সযত্নে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির কারণটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এরা জানতে দেয়নি যে কেবলমাত্র হিন্দুদের হোমল্যান্ড হিসেবেই পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি।

আর আজ সেই বাংলার জেলায় জেলায় হিন্দু আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের ধর্মাচরণ করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে হচ্ছে। নলিয়াখালী, দেগঙ্গা, কালিয়াচক, ধুলাগড়, বাদুড়িয়ায় একের পর এক সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চলেছে এবং এর নেপথ্যে থেকেছে শাসকদলের নেতৃত্বের প্রশ্রয়। সিএএ-এর প্রতিবাদের নামে বাংলা দেখেছে ভয়ঙ্কর উন্মাদনা। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ট্রেন, রেল স্টেশন, রেল লাইন উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এর পরেও প্রশাসন এদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বরঞ্চ সিএএ-এর নাম করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা, তাদের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করাকেই এরা শ্রেয় বলে মনে করেছে। ফলে মুসলমানদের একটা অংশ হয়তো উপলব্ধি করতে পারেনি যে সরকার প্রকৃতপক্ষে তাদের শিক্ষা দীক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির মত মূল সমস্যার কোন কিছুই সমাধান করেনি।

আর সেই কারণেই এই ধরণের উস্কানিমূলক ভাষণ আগামী দিনে যে আরও হতে পারে সে আশঙ্কা থেকেই যায়।

এটা তো গেল তৃণমূল সরকারের অপদার্থতার কথা। কিন্তু নাগরিক মহলের এমন প্রতিক্রিয়া কেন? তাদের তো আর ভোটব্যাঙ্কের বালাই নেই। আসল কথা হল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বলতে যাদের দেখানো হয়, যারা সমাজের বিভিন্ন ঘটনায় নিজেদের মন্তব্যের মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত করতে পারেন তাঁদের একটা বড় অংশ বামপন্থী মনোভাবাপন্ন। এদের কাছে হিন্দুদের জীবনের কোন মূল্য নেই। তাই এরা বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে যখন হিন্দুদের উপর পাশবিক অত্যাচার হয় তখন চুপ থাকেন অথচ প্যালেস্টাইনের ওপর ইজরায়েলের আক্রমণ হলে রাস্তায় নেমে পড়েন। বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে হিন্দুরা যখন আশ্রয় নেন তখন তাঁদের নাগরিকত্ব দিতে গেলে এদের চরম আপত্তি অথচ রোহিঙ্গাদের ভারতে আশ্রয় দিতে এঁরা সোচ্চার হন। আরেকটা বিষয় হল অনুপ্রবেশ। বিগত বাম আমল থেকেই এটা শুরু হয়েছিল আর এই আমলে এটা ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে। এই অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জনবিন্যাসের পরিবর্তন হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত হারে। আজ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুরা হয়ে গেছেন সংখ্যালঘু। আর এই বিষয়টাকেই মাথায় রেখে ৭০-৩০ -এর পরিসংখ্যান বুঝিয়ে হুমকি দিচ্ছেন হুমায়ুন কবীর।

কিছুদিন আগেই চড়কের সময় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় ধর্মীয় সন্ত্রাসের ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে যা সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টিগোচর হয়নি। সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে কোন সংবাদ মাধ্যমকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। অবাধে ভাঙচুর করেছে মন্দির। হ্যাঁ, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটা ঠিক এমনই। তাই হুমায়ুনরা দর্পের সঙ্গে দু'ঘন্টার মধ্যেই হিন্দুদের ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা জোর গলায় বলতে পারে। শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের হিন্দুদের বাসভূমিতে আজ হিন্দুরাই ব্রাত্য। বিজেপি ছাড়া আজ তাদের কথা কেউ বলেনা, ভাবেনা। তাই হুমায়ুনদের কাছে বিজেপি আর হিন্দু সমার্থক শব্দ হয়েছে। আশা করব এর পরে হিন্দুদের নিদ্রাভঙ্গ হবে, একত্র হয়ে তারা শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের বাংলাকে গড়ে তুলবে।

কর্মসংস্থান না বাড়লে

কীভাবে ভারতের শহরে-শহরে পৌঁছে গেল মেট্রো পরিষেবা?

কংগ্রেস বলবে, বিজেপি করবে

/BJP4Bengal bjpbengal.org

বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

শেষ ১৫ বছর এক নজরে

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিরূপ ঘোষ

শেষ ১০০ বছরে বাংলায় যত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেছে ভারতবর্ষের আর কোথাও এত ঘটে নি। বারুদের স্তূপের উপর বসে আছে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ আজ সামগ্রিকভাবে মৌলবাদী এবং জেহাদি শক্তির মুক্তাঞ্চল হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় বিভাজনহীন রাম রাজ্যের সুশাসন এবং সেই রাম রাজ্যে সবার সঙ্গে সবার বিকাশই একমাত্র সমাধানের পথ। রাম বিবাদ-সংঘর্ষ নয়, যোগাযোগ ও মিলনের পথ।

একটা কথা খুব প্রচলিত আছে যে- বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার নাকি কোন জায়গা নেই। এর থেকে মিথ্যা কথা আর বোধহয় কিছু হয় না। শেষ ১০০ বছরে বাংলায় যত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেছে ভারতবর্ষের আর কোথাও এত ঘটে নি। এই সময়কালের মধ্যে বাংলার (বিশেষত পূর্ববঙ্গের) মাটি বাঙ্গালী হিন্দুর রক্তে, হিন্দু বাড়ির ধর্ষিতা মেয়ে-বউদের হাহাকারে অজস্রবার কম্পিত হয়েছে। আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নতুন গতি পায় ১৯০৬-এ মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। যা কিন্তু বর্তমানের পাকিস্তানে হয় নি, হয়েছিল ঢাকা-তে। এই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পিছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহ। প্রখ্যাত বামপন্থী ইতিহাসবিদ সুরঞ্জন দাস তাঁর 'Communal Riots in Bengal 1905-1947' গ্রন্থে এইসময় দুই বাংলায় ঘটা অজস্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৯১ সালের মে মাসে কলকাতা সংলগ্ন শহরতলীর শিল্পাঞ্চলে একটি দাঙ্গা হয়। এর পরে ১৮৯৬-এ গার্ডেনরিচে বকরি-ঈদ কে কেন্দ্র করে ও উত্তর কলকাতার টালা অঞ্চলে ১৮৯৭-এ একটি বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়।

বিংশ শতকের শুরুতে ১৯০৬-৭ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে ভয়াবহ হিন্দু-বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এর পরের দশকে কলকাতায় দুটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯১০ ও ১৯১৮-র সেপ্টেম্বরে হয়। এরপর ১৯২৬ সালে একযোগে কলকাতা (এপ্রিল-জুলাই), পাবনা (জুলাই) ও ঢাকায় (সেপ্টেম্বর) বেশ কয়েকটি বড় মাপের দাঙ্গা হয়। পরের বছরই ১৯২৭ সালে পটুয়াখালি ও পোনাবালিয়া-তে দাঙ্গা হয়। এরপর ১৯৩০ সালে ঢাকা ও কিশোরগঞ্জ এবং ১৯৩১-এ চট্টগ্রাম-এ বড় হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে সুরঞ্জন দাসের উপরিউক্ত বইটিতে। এরপর ১৯৪০-এর দশকের শুরুতেই ১৯৪১ সালে ঢাকাতে একটি ভয়াবহ দাঙ্গা চলে (মার্চ-মে মাস) প্রায় ৩ মাস ধরে। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ পাওয়া যায় অন্বেষা রায়ের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'Making Peace, Making Riots: Communalism and Communal Violence, Bengal 1940-1947' তে।

এরপর ১৯৪৬ সালে যে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয় বাংলায় তা সম্ভবত পূর্বে

কখনও হয় নি। তখন অখণ্ড বঙ্গে মুসলিম লিগের সরকার। ১৯৪৬-এর ১৬ই অগাস্ট রমজান মাসের জুম্মা বারে মুসলিম লীগ কলকাতায় এক ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু করে। মাত্র দু'দিনের মধ্যেই কলকাতায় ১০ হাজারের ওপর হিন্দুকে হত্যা কড়া হয় এবং হাজার হাজার হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়। আত্মরক্ষার্থে হিন্দুরাও প্রত্যাঘাত করে ও সহস্রাধিক মুসলিম হত্যা করে। এরপর ১৯৪৬ -এর ১০ই অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলায় এক ভয়াবহ হিন্দু গণহত্যা শুরু হয়। ২০ হাজারের ওপর হিন্দুকে হত্যা করা হয় এবং হাজার হাজার হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়। অজস্র মানুষকে জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। এরপর ১৯৫০, ১৯৬৪, ১৯৭১, ১৯৯২, ২০০১ এও অজস্র হিন্দু গণহত্যা সংগঠিত হয় পূর্ববঙ্গে যাতে লক্ষাধিক বাঙ্গালী হিন্দু প্রাণ হারিয়েছেন আর এক কোটির ওপর মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

বিগত ১০-১৫ বছরেও পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি দাঙ্গা হয়েছে। এবিপি নিউজ, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দ্য বিজনেসলাইন, এনডি টিভি, হিন্দুস্তান টাইমস, স্বদেশ সংহতি সংবাদ, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ডিএনএ নিউজ, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ফার্স্টপোস্ট প্রভৃতি সংবাদপত্র ও নিউজ চ্যানেল থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে।

দেগঙ্গা ২০১০:-

দেগঙ্গার চট্টোলপল্লী গ্রাম। স্বয়ং রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই গ্রামের। এই গ্রামেই পাশাপাশি রয়েছে হিন্দুদের একটি দুর্গাপূজার স্থান এবং মুসলিমদের একটি কবরস্থান। স্থানীয়দের বক্তব্য কবরস্থানের এলাকাটি বিতর্কিত এবং দখলকৃত। কবরস্থান এবং দূর্গা মন্ডপের মাঝের রাস্তাটা দূর্গা মন্ডপ যাওয়ার একমাত্র পথ কিন্তু ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই রাস্তাটা পাঁচিল তুলে দিতে চায় মুসলিমরা। যেহেতু ওই রাস্তায় পাঁচিল তুলে দিলে দুর্গাপূজা করা কঠিন হয়ে যাবে তাই হিন্দুরা বাধা দেয়। সমস্যা না মিটলে হিন্দুরা কাছেই অবস্থিত থানায় খবর দেয় এবং পুলিশ এসে সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান করে যায় কিন্তু পুলিশ ফিরে যেতেই শুরু হয় আক্রমণ। মুহূর্তের মধ্যে আক্রমণ ছড়িয়ে যায় গোটা এলাকায়। দশ-বারো-চোদ্দ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে চলে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ থেকে সম্পত্তি নষ্ট। শুধুমাত্র কার্তিকপুর বাজারেই ২০০ দোকান লুটপাট করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আক্রমণ নেমে আসে হিন্দুদের মন্দিরগুলোর ওপরেও। কার্তিকপুরের একটি এবং দেগঙ্গার বিপ্লবী কলোনির একটি মন্দির ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয় খুব দ্রুত। ওই এলাকারই নীলাঞ্জন সরকার জানান, উনি নিজে দেখেছেন সাংসদ নুরুল ইসলামকে দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিতে। ওনার এবং স্থানীয় হিন্দুদের প্রায় সকলের অভিযোগ বেলিয়াঘাটা এবং বসিরহাট থেকে ট্রাকে করে নিজেদের লোক নিয়ে এসে হাজি নুরুল ইসলাম কালী মন্দির, শনি মন্দির এবং দুর্গা মণ্ডপে ভাঙচুর করেন। এলাকায় পুলিশ এবং র‍্যাফ মোতায়েন থাকলেও তারা বিশেষ কিছু করতে পারেনি। দেগঙ্গা থানার ওসি অরূপ ঘোষের মাথায় গুরুতর চোট লাগে পরবর্তীতে আধাসেনা নামিয়ে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ধূলাগড়, ২০১৬:-

ধূলাগড় হাওড়া জেলার এক ক্ষুদ্র এলাকা। রাজ্য প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র নবান্ন থেকে যার দূরত্ব মেরেকেটে কুড়ি কিলোমিটার। সেই ধূলাগড়ই খবরের শিরোনামে (ঘটনার প্রায় দু'সপ্তাহ পর) আসে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে নিজেদের পরব উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের করেছিল মুসলিমরা। অভিযোগ সেখান থেকে বোমা ছোঁড়া হয় হিন্দুদের বাড়ি, দোকানপাট এবং এলাকা লক্ষ্য করে। লুট হয়ে যায় একের পর এক হিন্দুদের বাড়ি। কেড়ে নেওয়া হয় টাকা-পয়সা, সোনাদানা থেকে বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী (স্থানীয় মুসলিমদের একাংশ দাবি করে তাদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় বাধা দিয়েছিল হিন্দুরা। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মতে একথা সত্যি নয়। তারা প্রশ্ন করে ধর্মীয় শোভাযাত্রায় আগ্নেয়াস্ত্র এল কীভাবে। শোনা যায় হামলাকারীদের অধিকাংশই বহিরাগত এবং কলকাতার কুখ্যাত মেটিয়াবুরুজ থেকে এসেছিল বহিরাগতদের একটা বড় অংশ। যাই হোক ধর্মান্ধ দাঙ্গাকারীদের আক্রমণে আহত হয়েছিল বহু। শিশু-সন্তান এবং বয়স্কদের নিয়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল হাজার হাজার হিন্দু পরিবার। 'ইন্ডিয়া টুডে'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (প্রকাশিত ২৮শে ডিসেম্বর, ২০১৬) প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন মিছিল থেকে সেদিন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান এসেছিল।

নবান্ন থেকে ঘটনাস্থল কুড়ি কিলোমিটার দূরে হলেও পুলিশ এসেছিল প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর আর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দাঙ্গাকারীদের আটকানোর পরিবর্তে আক্রান্তদেরই এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। বোঝা কঠিন নয় যে রাজ্য সরকার প্রথমদিকে পদক্ষেপ করতে চাইনি। পরে অবশ্য মুখ বাঁচাতে হাওড়া (গ্রামীণ) পুলিশ সুপারকে সরিয়ে দিয়েছিল সরকার। তাতে অবশ্য সমস্যা মেটেনি। ঘরছাড়াদের ঘরে ফিরতে প্রতিরোধের রাস্তায় হাঁটতেই হয়েছিল। প্রতিরোধ এসেছিল ঘটনার প্রায় দুই সপ্তাহ পর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। হিন্দুরা প্রতিরোধে রাস্তায় হাঁটতে শুরু করার সাথে সাথেই রাজ্য সরকার বাধ্য হয় পদক্ষেপ করতে। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ঘটনার প্রায় ১৮ দিন পরে কোনো এক উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাকে উদ্ধৃত করে জানায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ধুলাগড়ের ঘটনায়। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দাবি করেছিলেন কিছুই নাকি ঘটেনি। প্রশ্ন উঠেছিল কিছুই না ঘটলে গ্রেফতারির সংখ্যা ৬৫ হয় কী করে! প্রশ্ন উঠেছিল কিছুই না ঘটলে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাসের সেল ছুঁড়তে হল কেন! প্রশ্ন উঠেছিল কিছুই যদি না ঘটে তবে দিলীপ ঘোষ, জাগদম্বিকা পাল, সতপাল সিং আর রাহুল সিনহাকে এলাকায় যেতে দেওয়া হলনা কেন! সব থেকে বড় কথা কিছুই যদি না ঘটে তবে যৎসামান্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করার মানেই বা কি! আর সেটাও সব কিছু সামনে আসার পর! হিসাবটা স্পষ্ট, হিন্দুরা সংগঠিত ভাবে প্রতিরোধ না করলে অন্য আরো অনেক ঘটনার মত ধূলাগড়ও হারিয়ে যেত ইতিহাসের অন্ধকারে।

ইলামবাজার ২০১৬:-

ইলামবাজারে একটা সামান্য ফেসবুক পোস্ট নিয়ে লঙ্কাকান্ড বাঁধিয়ে দিল মুসলিম জনতা। পোস্টকর্তা এক কলেজ ছাত্র। যাইহোক দাঙ্গাকারীদের মনে হয়েছিল ইসলামকে আক্রমন করা হয়েছে উক্ত পোস্টে তাই এবারেও পরপর জাতীয় সড়ক অবরোধ আর থানা আক্রমণ। প্রতিরোধের প্রাথমিক চেষ্টা আসতে এবারে দেরি হয় নি। প্রারম্ভিক সংঘর্ষেই তাই প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে যায় ইলামবাজারে। মৃতের নাম রেজাউল ইসলাম। তিনি আরো অনেকের

সাথে জাতীয় সড়ক অবরোধে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বলে পুলিশ জানায়। পুলিশের কনভয় আটকে হাজার হাজার উন্মত্ত জনতা কলেজ পড়ুয়া হিন্দু কিশোরকে থানা থেকে ছেড়ে তাদের হাতে তুলে দেবার দাবি জানালো। আইনত যা কোনদিনই সম্ভব নয়।

কালিয়াচক ২০১৬:-

একটা সময় ছিল যখন খুচরো বাম নেতার কাছে সামান্য বাড়ির সমস্যা নিয়ে গেলেও রাশিয়ার বিপ্লব, চীনের সমাজতন্ত্র আর ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধের গল্প শুনতে হত রাজ্যবাসীকে। নিজেদের উত্তরাধিকারী রেখে বামেরা চলে গেল এগারো সালে। দেশ আর রাষ্ট্রের জায়গা নিল ধর্ম। আজম খান উত্তরপ্রদেশের বিতর্কিত নেতা ও জনপ্রতিনিধি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের সমকামী বলে অভিহিত করে নোংরা মন্তব্য করেছিলেন তিনি। প্রত্যুত্তরে উত্তরপ্রদেশেরই কমলেশ তিওয়ারি নামে জনৈক হিন্দু মহাসভার নেতা (হিন্দু মহাসভা জানিয়েছে এই নামে তাদের কোনো কার্যকর্তা নেই) মন্তব্য করেছিলেন ইসলাম নিয়ে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তখন অখিলেশ যাদব। তিনি আজম খানের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা না নিলেও কমলেশ তিওয়ারির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করান। এই বিষয়টিকে নিয়ে মালদার কালিয়াচকে বিশ্ব মুসলিম দরবার এক বড় মিছিল বার করে। লাখ লাখ উত্তেজিত জনতা চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে মিছিল করার সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে এক সরকারি বাস ঢুকে পড়ে মিছিলের মধ্যে। বাসের দ্বারা কেউ আহত না হলেও উগ্র জনতা প্রথমে ওই বাসে আর তারপর আশপাশের সমস্ত গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা তিনটে বেসরকারি বাস সমেত অধিকাংশ যানবাহনে আগুন লাগানোর সময় দাঙ্গাকারীরা বেছে বেছে ৭৮৬ লেখা গাড়িগুলোকে ছাড় দেয়। জাতীয় সড়কে এই তান্ডব চালানোর পর দাঙ্গাকারীরা হামলা চালায় কালিয়াচক থানায়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় থানার গাড়ি, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, নথি থেকে আরম্ভ করে সবকিছুকে। লাখখানেক হামলাকারীর এই আক্রমণ সামলাতে গেলে গুলি চালানো ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু আইন ব্যবস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানো দাঙ্গাকারীদের উপর গুলি চালানোর আদেশ দেয়নি উচ্চতর কর্তৃপক্ষ।

ফলে প্রাণ বাঁচাতে পালাতে বাধ্য হয় থানার পুলিশকর্মীরা। থানা তছনছ সম্পন্ন হলে উত্তেজিত হামলাকারীরা কালিয়াচক থানার পিছনে বালিডাঙ্গাতে একটি শনিমন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়। সিলামপুর অঞ্চলে বেশ কিছু হিন্দু বাড়িতে লুটপাট করা হয়। বেছে বেছে বোমা ছোঁড়া হয় হিন্দুদের বাড়ি লক্ষ্য করে। এই গোটা হামলা এবং উত্তেজনা সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দেয় ধর্মীয় নেতা আনাউল হক আর সিপিএমের প্রাক্তন জেলা সভাধিপতি শেফালী খাতুন। কালিয়াচকের দাঙ্গা অনেকদিন টিকে ছিল। শেফালী খাতুন সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করতে গেলেও বাধা দেয় দাঙ্গাকারীরা। কালিয়াচককে শান্ত করা শুধুমাত্র কিছু পুলিশের কম্ম ছিল না। শোনা যায় বেশ কিছু হিন্দু এবং জাতীয়তাবাদী সংগঠন এরপর আসরে নামে। হিন্দুঐক্যের ফলশ্রুতিতে ভেঙে দেওয়া মন্দিরে কয়েকদিনের মধ্যেই পুজো শুরু হয় বলেও শোনা যায়। শেষমেষ জানুয়ারির শেষদিকে চোরাগোপ্তা আক্রমণ ছাড়া কালিয়াচক মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে যায়।

বাদুড়িয়া, ২০১৭:-

সত্যি বলতে কী ভারতের প্রচলিত মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবি সমাজে দ্বিচারিতা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। বিখ্যাত ফেসবুকীয় বাম শিবলিঙ্গকে নোংরা ভাবে অপমান করে ছাড় পেয়ে যান। যাদবপুরের তথাকথিত মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীরা মা দুর্গাকে নিয়ে চরম কুরুচিকর পোস্ট করেও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ান চারপাশে। তাদের কিচ্ছু হয় না। কিন্তু সতেরো বছরের এক নাবালক ছাত্র যখন তুলনামূলকভাবে অনেক কম অপরাধমূলক একটা পোস্ট করে ফেসবুকে, তখন জ্বলে ওঠে বাদুড়িয়া। দোসরা জুলাই ফেসবুকে ফটোশপ করা এক পোস্ট করে ওই নাবালক। ওই নাবালকের প্রতিবেশী হাজী ওসমান মোল্লা 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন ওই নাবালকের পক্ষে ফটোশপের কাজ তো দূর অস্ত, ঠিকঠাকভাবে কম্পিউটার চালানোই সম্ভব না। যাই হোক পোস্ট করার কয়েক ঘন্টার মধ্যে কয়েক হাজার মুসলিম জনতা ঘিরে ধরে বাদুড়িয়া থানা এলাকাকে। প্রায় তিরিশ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে অবরোধ করে দেওয়া হয় এলাকায় ঢোকা-বেরোনোর সমস্ত রাস্তাকে। পরদিন ওই নাবালককে গ্রেপ্তার করে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। কিন্তু উন্মত্ত দাঙ্গাকারীদের দাবি ছিল সতেরো বছরের ওই ছেলেটাকে তুলে দিতে হবে তাদের হাতে। যথারীতি দাবি মানা সম্ভব ছিল না। তাই ধর্মান্ধ দাঙ্গাকারীরা এরপর আগুন লাগিয়ে দেয় থানায়। পুড়ে ছাই হয়ে যায় বেশ কয়েকটা পুলিশের জিপ। অভিযোগ পাথর ছোড়া হয় পুলিশদের লক্ষ্য করে। এসব করেই অবশ্য দাঙ্গাকারীরা ক্ষান্ত হয়নি। তারা এলাকায় হিন্দুদের দোকানগুলোয় এবং বাড়িতে আগুন ধরাতে শুরু করে। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ওই নাবালকের বাড়িতেও। ভাঙচুর করা হয় শববাহী গাড়ি। রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় সে গাড়িতে থাকা লাশ। অভিযোগ স্থানীয় মসজিদ থেকে মাইকিং করে মুসলিমদের জড়ো হতে বলা হয় মসজিদের সামনে।

আসানসোল, ২০১৮:-

২০১৮ সালের মার্চে চিরাচরিতভাবে রামনবমীর মিছিল বেরিয়েছিল আসানসোলের চাঁদমারি এলাকায়। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর সেই মিছিলে আটকায় স্থানীয় কিছু মুসলিম যুবক। ওই যুবকদের উদ্দেশ্য আসলে ছিল সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। তাই ওই অঞ্চলে একটা ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্র এবং বোমা মজুত করেছিল হামলাকারীরা। সেই অস্ত্রের বলে বলিয়ান হয়েই তারা হামলা চালায় রামনবমীর মিছিলে। ভেঙে দেওয়া হয় রথ। পুড়িয়ে দেওয়া হয় রামচন্দ্রের মূর্তি। তারপর একে একে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় অসংখ্য দোকান এবং বাড়িতে। দলে দলে এলাকা ছাড়তে থাকে হিন্দুরা। কেউ অন্ডাল কেউ বরাকর বা কেউ দুর্গাপুরে এসে সাময়িক আস্তানা গাড়ে। ঐদিন এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা সরকারিভাবে এক হলেও বেসরকারি মতে পাঁচ। আক্রান্ত বহু। রামনবমীর মিছিলে আক্রমণের পর হিন্দুদের তরফ থেকে সেদিন আর সেভাবে প্রত্যাঘাত নেমে আসেনি। তবে ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে থেকেই হিন্দুরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছিল এই অঞ্চলে। সম্ভবত এরই ফলশ্রুতিতে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতে সংসদে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল সুপ্রিয় ঘটনাস্থলে আসেন পরদিনই। তিনি অভিযোগ করেন পুলিশ তৃণমূলের গুন্ডার মত ব্যবহার করছে। এলাকার সাংসদ তথা একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ঘটনাস্থলে যেতে বাধা দেওয়া হয় পুলিশের তরফ থেকে। জোর করে যেতে চাইলে এফআইআর করা হয় তাঁর নামে। একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে ন্যূনতম নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেনি রাজ্য পুলিশ। বাবুল সুপ্রিয়র উপস্থিতি স্থানীয় হিন্দুদের কতটা উৎসাহিত

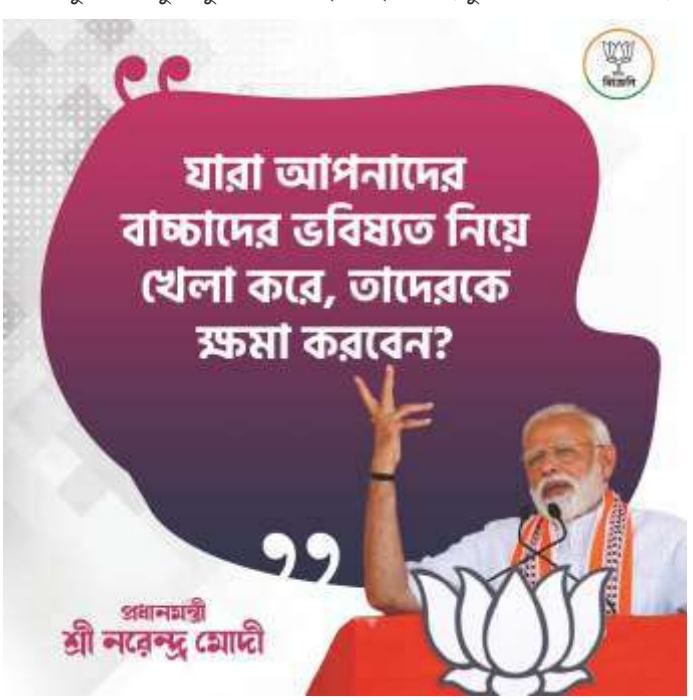

করেছিল বলা কঠিন। কিন্তু ঘটনার পরদিন থেকেই হিন্দুরা নিজেদের জমি উদ্ধার শুরু করে। প্রশাসন বুঝতে পারে হিন্দুত্ববাদ আবার নিজের জমি ফিরে পেয়েছে আসানসোলে। ভোটব্যাঙ্ক তোষণে ব্যস্ত রাজ্যের প্রশাসন তাই এবার পূর্ণ শক্তি নিয়ে নেমে পড়ে হিন্দুদের আটকাতে। প্রচুর পুলিশ নিয়োগ করা হয় এলাকায়। বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট। ব্যাপক মাত্রায় চলে ধরপাকড়। তবে এসব করেও খুব একটা সুবিধা করতে পারে না প্রশাসন। একদিকে প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও হিন্দুরা নিজেদের জমি উদ্ধার করছিলো বীরদর্পে, অন্যদিকে বিজেপি তৎকালীন সভাপতি অমিত শাহ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কমিটি তৈরি করে রিপোর্ট তলব করছিলেন ঘন ঘন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিল রাজ্য সরকারের কাছে।

হাওড়া এবং হুগলি, ২০২৩:-

রামনবমী শোভাযাত্রা বঙ্গদেশের দীর্ঘদিনের রীতি। গোটা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এ রাজ্যেও ওই পবিত্র তিথিতে শোভাযাত্রায় পা মেলান বাঙালিরা। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আয়োজকের দ্বারা সংঘটিত এই শোভাযাত্রাগুলি বাঙালিপ্রাণের অতি ঘনিষ্ঠ। তবে রাজ্যের তোষণকারী শাসক দল কবেই আর সনাতনী বাঙালির আবেগের কথা ভেবেছে! তাইতো রামনবমীর দিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন সংখ্যালঘু মানুষ থাকেন এমন জায়গা দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মিছিল গেলে 'বিশেষ ব্যবস্থা' নেওয়া হবে। সেই বিশেষ ব্যবস্থা প্রথম টের পেয়েছিলেন হাওড়ার শিবপুরের সনাতনীরা। জাতীয় সড়ক ধরে এক বিশেষ অঞ্চল পেরোনোর সময় রামনবমীর পবিত্র শোভাযাত্রায় শুরু হয় ইট বৃষ্টি, নেমে আসে অতর্কিত আক্রমণ। প্রতিবারের মতো এবারও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এমনকি যখন একের পর এক দোকান বা সরকারি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখনও পুলিশ যথার্থ ভূমিকা পালন করেনি। দিনের আলোর মত স্পষ্ট পরিকল্পিত আক্রমণ নেমে এসেছিল হিন্দুদের উপর। বহু ভিডিও পরিষ্কার প্রমাণ দিচ্ছে আক্রমণের শিকার হিন্দুরা। তবুও নিজের তোষণের রাজনীতি বজায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী এ যাত্রাতেও দোষ চাপিয়েছিলেন সনাতনীদের উপরেই। ৩০শে মার্চের সেই আক্রমণের কয়েকদিন পর ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নরসিমার রেড্ডির নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের এক কমিটি। তাঁরা এই আক্রমণকে পূর্বপরিকল্পিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ হিসেবে বর্ণনা করে এনআইএ তদন্তের পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজ্যকে। ৩০শে মার্চের শিবপুর এবং ডালখোলার আক্রমণ (মৃত-০১) যে একটা বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ সেটা বোঝা যায় পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যেই। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শাসক দল তথা তাদের অনুগত পুলিশ বাহিনীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহায়তায় তথা ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তায় শুরু হয় সনাতনী সমাজের উপর অকথ্য অত্যাচার। হুগলি রিষড়া এবং শ্রীরামপুর অঞ্চলে আক্রমণ তার মধ্যে অন্যতম। শান্ত এবং সংযত ভাবে চলা শোভাযাত্রার উপর পাথর এবং বোমা নিয়ে আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ তথা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে প্রশাসনের মদতে লুটপাট বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে।

ধর্মীয় দাঙ্গার হটস্পট হয়ে ওঠছে পশ্চিমবঙ্গ। এমনিতে অত্যাচারিত কেউ, বিশেষত সনাতনী মানুষ, রিপোর্ট করতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, নয় ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। তবে যেসব ঘটনা অত্যন্ত বড় এবং লাইমলাইটে চলে আসে কিংবা মামলা আদালতে ওঠে সেগুলোর রিপোর্ট পুলিশ নিতে বাধ্য হয়। তবে সে সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ শতাংশের বেশি নয় বলেই অনেক বিশেষজ্ঞের মত। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার শতকরা প্রায় নব্বই থেকে পঁচানব্বই শতাংশের কোনো রিপোর্ট হয় না। যাক যেটুকুর রিপোর্ট হয় সেটুকুই কতটা ভয়ংকর তা দেখা যাক। তথ্য জানার অধিকার আইনে এক ব্যক্তি জানতে চেয়েছিলেন জানুয়ারি, ২০২১ থেকে জুন, ২০২২ এর মধ্যে দেড় বছরে পশ্চিমবঙ্গের মোট কতগুলি দাঙ্গা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি পুলিশ জেলা এবং কমিশনারেটে তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করেছিলেন তিনি। বলাই বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি উত্তর পাননি। মাত্র বারোটি ক্ষেত্রে তিনি যা রিপোর্ট পান তাতে দেখা যাচ্ছে ওই ১৮ মাসের মধ্যে ওই ১২টি এলাকায় ৬৫ টি ধর্মীয় হিংসার ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে ওই ১৮ মাসের মধ্যে ওই ১২টি এলাকাতেই দাঙ্গার ঘটনা রিপোর্ট হয়েছে (বাস্তব সংখ্যা অবশ্যই অনেক বেশি) ২০০টি। বলার অপেক্ষা রাখে না গোটা রাজ্যের সামগ্রিক ঘটনার প্রকৃত সংখ্যা (রিপোর্টেডটুকু শুধু নয়) হিসাব করলে তা বহুগুণ বেড়ে যাবে। অবাক করা কথা হল ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো বা জাতীয় অপরাধ সংস্থায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মাত্র একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বাকিগুলিকে বেমালুম চেপে দেওয়া হয়েছে।

বারুদের স্তূপের উপর বসে আছে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। সীমাহীন তোষণ, পুলিশ প্রশাসনের নির্লজ্জ একপাক্ষিকতা, বদলে 'দেওয়া' জনবিন্যাস এবং সর্বোপরি রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ স্তর থেকে ভোট রাজনীতির নোংরা খেলার অংশ হিসাবে বিশেষ সম্প্রদায়কে জাতিগত দাঙ্গা এবং হিংসায় কাজে লাগানোর ফলশ্রুতি হিসাবেই পশ্চিমবঙ্গ আজ সামগ্রিকভাবে মৌলবাদী এবং জেহাদি শক্তির মুক্তাঞ্চল হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। ছেচল্লিশের নোয়াখালী থেকে আজকের সন্দেশখালি সেই ঘটনার ইঙ্গিতটাই দিতে চাইছে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

প্রসঙ্গ, সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ

রুবি সাঁই

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রযোজ্য হলে সর্বাপেক্ষা সুখী ও নিরাপদ হবে ভারতবর্ষে বসবাসকারী অনুন্নত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ। হিন্দু জনগণের পক্ষে বিস্তারিত আইন প্রয়োগ অচিরেই হয়ে আছে যার ফলে বহুবিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন সহজলভ্য। এই বিধি চালু করতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ আগ্রহী এবং এই বিষয়টি তাদের সঙ্কল্পপত্রে রয়েছে।

মানবসম্পদের যথাযথ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য এবং পাশাপাশি লিঙ্গ বৈষম্যকে সমাজের তৃণমূল স্তর থেকে উপড়ে ফেলার জন্য ইউনিফর্ম সিভিল কোডের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বর্তমান ভারতবর্ষের সামাজিক ও আইনগত ব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে বিধির প্রয়োগ হয়। যার ফলে শাসন ব্যবস্থা সুস্থভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের বিস্তর ক্ষেত্রে এমন কতগুলি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র উপস্থিত হয় যেখানে কিছু -কিছু ধর্মীয় প্রথা মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং লিঙ্গ বৈষম্যকে ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালন করে। তাই সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ইউনিফর্ম সিভিল কোর্টের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিফর্ম সিভিল কোডকে যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে মানুষের আর্থসামাজিক জীবনযাপনে কোন ধরনের বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হতে পারে তা নিয়ে বিস্তর চিন্তাভাবনা চলছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রস্তুত এবং প্রবর্তন করতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ আগ্রহী এবং এই বিষয়টি তাদের সঙ্কল্পপত্রে রয়েছে।

ভারতবর্ষের সংবিধানের ২৫ -২৮ অনুচ্ছেদ ভারতীয় নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে প্রত্যেকের নিজস্ব বিষয় বজায় রাখার অনুমতি দেয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪-এর ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় নীতি প্রণয়নের সময় সকল ভারতীয় নাগরিকদের জন্য নির্দেশমূলক নীতি ও আইন প্রয়োগ করবে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কি?

ইহা মূলত রাষ্ট্রের জাতীয় ও সর্বজনীন নিয়মাবলি যাহার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটা স্তরের জনসাধারণের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে অভিন্ন আইনের প্রতিষ্ঠা। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় ভূখণ্ডের সর্বত্র একই আইনের শাসন সুনিশ্চিত করা।

ভারতীয় সংবিধানের ধারা বা অনুচ্ছেদ ৪৪ কি?

ভারতীয় সংবিধানের রাষ্ট্রীয় নির্দেশক নীতির ধারা ৪৪-এ বলা হয়েছে যে রাজ্য তার নাগরিকদের ভারতবর্ষের সমগ্র অঞ্চলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রদান করার চেষ্টা করবে এবং ৪৪ ধারার অনুরূপ হওয়া, মানে ডায়রেক্ট প্রিন্সিপালস

অন স্টেট পলিসির ডায়রেক্টটিভ প্রিন্সিপালগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা। রাষ্ট্র তার জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণে সদা তৎপর থাকবে এবং একটি মাত্র আইন ভারতবর্ষের সর্বত্র ভূখণ্ডে প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে বৈষম্যকে দূর করা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

ইতিহাস বা অতীতের যন্ত্রণাসমূহ:

১৮৪০ সালে ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক বা প্রাক স্বাধীনতার পূর্বে লেকস লসির বিবরণী বা প্রতিবেদন ভারতীয় আইনি ব্যবস্থার সারগ্রন্থ রচনায় ঐক্যতার বিষয় অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন - অপরাধমূলক বিষয়, একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনগুলোকে নিয়মাবলীর বাইরে রেখেছিল।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সর্বেসর্বা রানির ঘোষণা অনুযায়ী ধর্মীয় বিষয় এর কোনরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। সুতরাং যখন অপরাধ সংক্রান্ত আইনের সারগ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল, একই সঙ্গে ব্যক্তিগত আইন সমূহকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বহাল রেখে শাসন ও প্রয়োগ করা ছিল মূল পদ্ধতি।

পরবর্তী ঔপনিবেশিক সময়কাল:

১৯৪৭ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে ড. বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ইউনিফর্ম সিভিল কোড অর্থাৎ এক দেশ এক আইনকে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্টেট পলিসি হিসাবে (অনুচ্ছেদ-৪৪) প্রয়োগের জন্য অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশেষ ভাবে ডায়রেক্টটিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। তৎকালীন ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উগ্রবাদীদের বিরোধিতা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিকৃত ধারণার পরিপন্থী হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।

(দ্য হিন্দু কোড বিল) প্রস্তাবিত হিন্দু আইনের নিয়মাবলি খসড়া কি?

ড. বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর প্রস্তাবিত হিন্দু আইনের খসড়া নির্মাণ করেছিলেন ভারতীয় সংবিধানের পুনঃসংস্কার করার জন্যে। ইহার কারণে হিন্দুদের বিবাহবিচ্ছেদ, বহুবিবাহ রোধ, কন্যা সন্তানদের সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মূলত চারটি আইন প্রণয়ন করেছিলেন।

সাকসেশন এ্যাক্ট বা হিন্দুদের উত্তরাধিকার বিধিবদ্ধ আইন – ১৯৫৬:

হিন্দুদের উত্তরাধিকার বিধিসম্মত আইন অনুযায়ী কন্যাসন্তানরা পিতৃপুরুষের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বঞ্চনা থেকে মুক্ত হতে শুরু করেন ১৯৫৬ সালে , কিন্তু আংশিক ভাবে বা নামমাত্র অধিকার প্রণয়নের ব্যবস্থা হয়। তৎক্ষণাৎ বিবেচনাধীন আইনের খসড়ার প্রস্তাবিত পরিবর্তন-এর মাধ্যমে (৯ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে) পুনরায় অধিকার স্থাপন ও বলবৎ করা হয়। এছাড়াও (The Hindu Marriage Act) হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, মেইনটেনেন্স অ্যাক্ট ও বিশেষ বিবাহ অ্যাক্ট একই সঙ্গে নির্মাণ ও প্রয়োগ করার প্রস্তাব হয়।

শাহবানু কেস:

এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য শাহবানুর বিষয়। ১৯৮৫ সালে ৭৩ বছরের শাহবানুর সংসার ভেঙে যায় ও বিবাহ বিচ্ছেদের সম্মুখীন হতে হয়, তাঁর স্বামীর মুখে উচ্চারিত তিন তালাক অর্থাৎ তালাক-তালাক-তালাক শব্দ ধ্বনি শোনার মাধ্যমে। শাহবানু সমস্ত আদালতে, যথা জেলা আদালত এবং উচ্চ আদালতে আবেদন জানান। শাহবানুর স্বামী সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানালো যে ইসলাম মতে যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন করেছেন। স্বামী হিসাবে সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৫ সালে শাহবানুর পক্ষে সেকশন ১২৫ ধারায় স্ত্রীর যাবতীয় ভরণপোষণ এর দায়িত্ব দেয় স্বামীকে। এই প্রথম আইন প্রয়োগ করা হয় শাহবানুকে কেন্দ্র করে। ১৯৮৫ সালে শাহবানু মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় রাজনীতিতে ইউনিফর্ম সিভিল কোড একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দেখা দেয়। ধর্মীয় ক্রিয়া কর্ম পালনের মৌলিক অধিকারের হস্তক্ষেপ না করে সমগ্র নাগরিকবৃন্দকে একই আইনের বিশেষ প্রয়োগ করার প্রশ্ন ওঠে এবং সেই মুহূর্ত থেকে বিতর্কের কালো মেঘ জমতে থাকে। কারন বিতর্কটি মুসলিম পারসোনাল ল-এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা আংশিক ভাবে শরীয়ত আইনের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছিল যেমন - একতরফা বিবাহবিচ্ছেদ, বহুবিবাহের অনুমতি ইত্যাদি ইসলামের শরীয়ত আইনের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৯ সালের নভেম্বর ও ২০২০ সালের মার্চ মাসে দুই বার এই শরিয়ত আইনের বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছিল। আবার সংসদে এই বিষয়টি প্রত্যাহারও করা হয়েছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে।

বিষয়, পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত:

পুনরায় এই প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রথমত মুসলমানদের পার্সোনাল আইন অনুযায়ী ভরণপোষনের দায়িত্ব কেবলমাত্র তিনটি চান্দ্র বা চন্দ্র সমন্বয়ী মাসের, মোটামুটি ভাবে ৯০ দিনের এবং একে বলা হয় ইদ্দাৎ (Iddat)। দ্বিতীয়ত সি আর পি সি (CRIMINAL PROCEDURE CODE) এর ১২৫ SECTION প্রযোজ্য নাগরিকদের ক্ষেত্রে, কারন স্ত্রীর ভরণপোষনের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাহবানুর রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ভারতবর্ষে আলোচনা, সমালোচনা, সভা সমিতি, মিছিলের ফলে ১৯৮৬ সালে ভারত সরকারকে খুব চাপে পড়তে হয়, বাধ্যতামূলক ভাবে একটি বিল বা আইন প্রনয়ন করতে হয় মুসলমান মহিলাদের অধিকার এর জন্য Rights on divorce বিল। এই বিল ১৯৮৬ সালে The Muslim women's Act নামে পরিগণিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য ভাবে বলা যেতে পারে যে সেকশন -১২৫ এর সি আর পি সি আইন মুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না অথচ অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা কেন হবে, তা নিয়ে নানান মতবিরোধ তৈরি হয়।

ড্যানিয়েল লতিফ কেস (Daniel Latif Case) :

জনসাধারণ প্রচণ্ড বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। অনুচ্ছেদ ১৪ এবং১৫ তে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা আছে সাম্যতা, কিন্তু এটিকে লঙ্ঘন করা (violated) হচ্ছে। অনুচ্ছেদ ২১ অনুযায়ী অধিকারের প্রসঙ্গ গভীরভাবে উল্লেখ করে সুপ্রিমকোর্ট আদেশ দেয় আইনগতভাবে (CRPC) সি আর পি সি-র সেকশন ১২৫ অনুযায়ী ইদ্দৎ-এর সময় আজীবন মহিলাকে ভরণপোষণ দিতে হবে একমাত্র ব্যতিক্রম যদি মহিলা অন্যত্র বিবাহ করেন।

সারিয়া মুদগল কেস (Saria Mudgal case):

এই কেস অনুযায়ী প্রশ্ন ওঠে একজন হিন্দু একবার বিবাহ করেন, হিন্দু আইন মোতাবেক। কিন্তু একইসময়ে ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে একজন মুসলমান কিভাবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে। মহামান্য কোর্টের নির্দেশে হিন্দুবিবাহ ব্যবস্থার পবিত্রতা হিন্দু ম্যারেজ (Hindu Marriage Act,1955) অ্যাক্টে বলা আছে। সুতরাং ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রচণ্ড

অপরাধযোগ্য হিসাবে প্রচলিত করা হোক। বিবাহের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা আই পি সি সেকশন ৪০৪ ধারায় অন্তর্ভুক্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হোক।

অভিন্ন আইনবিধি সংক্রান্ত বিতর্ক:

অভিন্ন আইন বিধি মূলত সকলের জন্য এক আইন কারন দেশ এক আইন এক, মূল উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে ঐক্যতার প্রয়োজন। ইউ সি সি প্রয়োগ আকস্মিক ভাবে সম্ভবপর নয় অতএব সচেতনতার যথাযথ শিক্ষা যেমন এই আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন, তেমনি এটি প্রয়োগের জন্য মানসিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। যেহেতু জনসাধারণের মধ্যে ভুল ভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে কারন বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও অনুভুতি প্রবণ। দিল্লির হাইকোর্ট মূলত এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ২০২১ সালে তিন মাসের মধ্যে খসড়া তৈরি করার জন্য বিচার বিভাগ উদ্যোগ শুরু করে। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে বিষয়টিকে সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরিতকরণের অনুরোধ করা হয়। কারণ নানা স্থানের হাইকোর্ট প্রধান বা সর্বোচ্চ বিচারালয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য রোধ করার উদ্দেশ্যে একটি খসড়া নির্মাণ হয়। সাত দিনের মধ্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতর্ক আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ওয়েবসাইট গণমাধ্যমেও প্রচারিত হয় সর্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্য।

সিভিল কোড গোয়া বিষয়:

ইউসিসির প্রসঙ্গে গোয়ার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী পর্তুগিজ গোয়ায় ও দমনে ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে ভারতের গোয়া রাজ্য ব্রিটিশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সেখানে "গোয়া সিভিল কোড" নামে পরিচিত একটি সাধারন পারিবারিক আইন বজায় রাখা ছিল। গোয়ার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সর্বপ্রথম গোয়াতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োগ ও প্রযোজ্য হয়। পারিবারিক আইন বলবৎ (১৮৭০ সালে) থাকলেও ১৯৬১ সালে গোয়ায় মুক্ত ও উদারনীতির সম্মিলিত পরিস্থিতি নতুন গোয়া সমাজ ব্যবস্থায় ইউসিসির পরিবর্তন হয়নি। গোয়ায় ইউসিসি বহুলভাবে উপস্থিত, গোয়া রাজ্য আজ পর্যন্ত ভারতে অভিন্ন নাগরিকবিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড সহ একমাত্র রাজ্য। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল প্রথমত গোয়ায় ইউসিসি অত্যন্ত প্রগতিশীল আইন এই আইনের ফলে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষেত্রে আয়ের সমান ভাগ সকলের প্রাপ্য। দুই, ছেলে মেয়ের কোন বিভেদ নেই। তিন, প্রতিটি জন্ম মৃত্যু এবং বিবাহতে তালিকাভুক্তকরণ হচ্ছে। চার, যে মুসলমান সম্প্রদায় গোয়ায় বসবাস করেন তাদের মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ প্রয়োগ করা যায় না। বিবাহের পরে বিচ্ছেদ বা মৃত্যু হলে সম্পত্তির অর্ধেক উত্তরাধিকারী সূত্রে আসবে, পিতা মাতা সন্তানদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না সুতরাং বর্তমান ভারতবর্ষের গোয়া রাজ্য একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হল ইউসিসির প্রয়োগ ও শক্তিশালী ভাবে বলবৎ রয়েছে। গোয়ায় ইউসিসির ফলে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণ যেমন ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্ট ও মুসলমান এবং হিন্দুরা কোনরকম বিরোধিতা ছাড়া একসঙ্গে বসবাস করে, প্রশ্ন হল গোয়ায় যদি একত্রিকরণের মাধ্যমে সুন্দরভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করা যেতে পারে সমগ্র ভারতবর্ষে তা পারা যাবে না কেন?

দাবি বা আপত্তি কিসের?

প্রথমত এই বিধির প্রয়োগ ভোট ব্যাঙ্ককে দূরে রাখতে সহায়তা করবে দ্বিতীয়ত হাণাফি মতাবলম্বীদের পার্সোনাল ল-এর বহুবিধ আইনের পথ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। হাজার বছর পুরনো মূল্যবোধ এবং ছিদ্রকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে ধ্বংস করে সমাজের অগ্রগতির ব্যবস্থার প্রয়োজন। পুরাতন মূল্যবোধের অপ্রাসঙ্গিক ভিত্তি অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে। তৃতীয়তঃ ভারতীয় সভ্যতায় জাতির ভাবনা ও প্রয়োগে জাতি বা ধর্মের রাজনীতি অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। পুরাতন ধ্যান ধারণায় বিরত থাকা, অর্থনীতির উন্নয়ন সামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন। চতুর্থত মহিলাদের অধিকারকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পার্সোনাল ল অন্তরায়। এই পার্সোনাল ল দীর্ঘ সময় নারী উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছিল। একশ্রেণীর নারী সামাজিক বৈষম্যের ফলে আইনগত সুখ-সুবিধা ভোগ করতে অসমর্থ ছিল। যে সমাজ ব্যবস্থায় এই আইন বলবৎ করা হয়েছিল সেটাই অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া অনুন্নত সমাজ। ভারতবর্ষ যখন ২.০ বা ৫.০ এর উন্নয়নের চিন্তাভাবনা করছে সেখানে পার্সোনাল আইন কঠিন বাধা। নারী ও পুরুষের সমান কর্মক্ষেত্র বা ভূমি ভারতবর্ষে একই সঙ্গে সমাজের অগ্রগতি নারী ও পুরুষের উভয়ের অগ্রগতি, নারীর মর্যাদা অতএব অতি জরুরী নারীর অধিকার এবং সম্মান রক্ষার।

বিজেপি কি বলছে?

ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি দল এই বিধিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী হিসাবে বিবেচনা করে কারণ এই বিধি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মতবাদ ও বিষয় (core ideological issue) বর্তমান ভারতবর্ষে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি জি "এই দুনিয়া পত্রিকায়" সাক্ষাৎকারের সময় মে ২০১৪ স্বীকার করেন যে এই অনুচ্ছেদকে নিয়ে ক্রমাগত তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় যোগী আদিত্যনাথ জি ২০১৪ সালের জুলাই মাসে সংসদে বিষয়টি পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন আইন মন্ত্রী মাননীয় রবি প্রসাদ জি, অনুচ্ছেদ ৪৪ এর বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে করেন। তাঁর মতে কেবলমাত্র স্বাধীনতা নয়, জাতীয় নির্দেশক নীতি ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইদানিং অন্য একটি গোষ্ঠী LGBTQIA- সম্প্রদায়কেও এই ইউসিসি আইনের অন্তর্ভুক্ত করার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছে। যেহেতু লিঙ্গ বৈষম্যও প্রাধান্য পেয়েছে সুতরাং বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতি:

ইউসিসি বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত সাড়া জাগানো বিষয়, রাজনৈতিক সামাজিক ও আইনগত দিক দিয়ে। ভারতবর্ষের ল কমিশনের আবেদনে প্রভূত পরিমাণে সাড়া পাওয়া গিয়েছে। ৭.৫ মিলিয়ন এবং তার বেশি সংখ্যক জনসাধারণ এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে রায় দিয়েছেন। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কেবলমাত্র গোয়া রাজ্যের বিষয় হতে পারে না ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যগুলোর বিষয় হয়ে উঠুক। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নারী সমাজ, বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের মানুষ এই বিধি প্রয়োগের ফলে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করুক। পরিশেষে এই বিধি প্রযোজ্য হলে সর্বাপেক্ষা সুখী ও নিরাপদ হবে ভারতবর্ষে বসবাসকারী অনুন্নত সংখ্যালঘু (Minority) সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ। হিন্দু জনগণের পক্ষে বিস্তারিত আইন প্রয়োগ অচিরেই হয়ে আছে যার ফলে, বহুবিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন সহজলভ্য। ভারত মাতার জয় হোক। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মঙ্গল হোক এই বিধির প্রয়োগে।

ফেক নিউজ

তৃণমূলের নকল সন্দেশ

ফেক খবর আর ভিডিওর সমস্ত সীমা পার করে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। কতটা নির্লজ্জ হলে একটা রাজনৈতিক দল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য নিয়ে সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলাদের অসম্মান করতে পারে তা তৃণমূলকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অবশ্য তৃণমূলের হাতে গোটা রাজ্যের মহিলাদেরই সম্মান যখন ভূলুণ্ঠিত তখন মমতা ব্যানার্জি সন্দেশখালির নির্যাতিতাদের বাদ দেবেন এটা ভাবা অন্যায়।

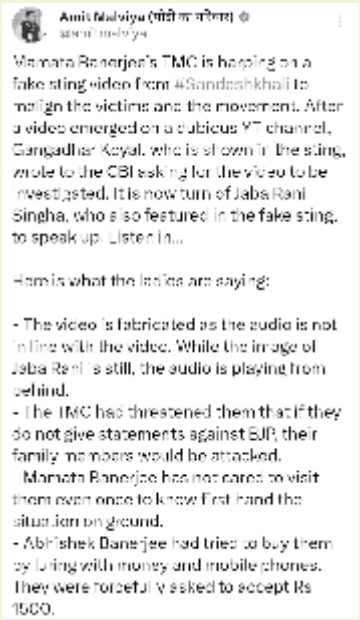

প্রথম ঘটনা বিজেপির মন্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালের গলার স্বর নকল করা। তৃণমূল কংগ্রেস গোটা রাজ্যের একটা বড় অংশের সোশ্যাল এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে একটা ফেক ভিডিও ছড়িয়ে দেয় রাজ্যে। ভিডিওটিতে সন্দেশখালির স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে ছোট করতে শোনা যায় গঙ্গাধর কয়ালের মুখে। যদিও মুখে শব্দ এবং ঠোঁটের চলন মিলছিল না। কিন্তু ফেক জেনেও তা সারাদিন ধরে দেখাতে থাকে প্রিন্ট মিডিয়ার একটা অংশ।

আসল খবরঃ

ভারতীয় জনতা পার্টির স্থানীয় নেতৃত্ব তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে সত্যি ঘটনা জানায় এবং ফেক ভিডিওর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে ওই ভিডিও ফেক না হলে বিজেপির সাহস হত না হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা, যেমন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার হাজারো মিথ্যে দাবিকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একবারও আদালতে যায়নি তৃণমূল।

Sandeshkhali sting video: BJP leader Gangadhar Koyal moves Calcutta High Court over 'fake voice'

The ruling Trinamul Congress in West Bengal had earlier this week shared a video of an alleged sting operation featuring Koyal

দ্বিতীয় ঘটনা সন্দেশখালীর দুই নির্যাতিত মহিলার ফেক ভিডিও বানানোর, যেখানে আবারও ওই মহিলাদের মুখে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাহায্যে কথা বসানোর চেষ্টা হয়েছে। ঘটনাচক্রে ওই দুই মহিলার একজনের স্বামী শাহজাহানের গুন্ডা বাহিনীর হাতেই খুন হয়েছিলেন। ওই নির্যাতিত মহিলা এবং এবারের উচ্চমাধ্যমিকে মেধা তালিকায় থাকা তাঁর ছেলে উভয়েই বয়ান দিয়েছেন যে তাঁদের ভিডিও ১০০ শতাংশ ফেক।

আদবানি জি রাহুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ

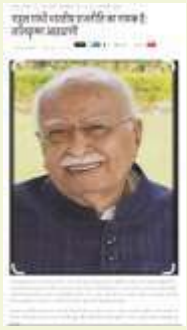

বিজেপির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির প্রশংসা করে, তাঁকে ভারতীয় রাজনীতির নায়ক বলেছেন। স্বভাবতই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন এমন একটা খবর দিয়ে হালে পানি পেতে চেয়েছিল ইতিমধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়া কংগ্রেস। কিন্তু কপাল মন্দ শাহজাদার।

আসল খবরঃ

কংগ্রেসের পোঁ ধরা ওয়েবসাইট avadhbhoomi.com খবরটি প্রকাশ করে প্রথম। নির্জলা এই ঢপের খবর লিখেছিল অনিল শুক্লা মধুকর। রহস্যজনক ওই ওয়েবসাইটের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে হল্যান্ড, নেদারল্যান্ড থেকে ২০২১-এর জানুয়ারিতে। দেশজুড়ে খোঁজখবর শুরু হতেই কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ ওয়েবসাইট খবরটি ডিলিট করে দেয় তড়িঘড়ি।

সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে ঘাসফুলের ফেক ভিডিও

পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাসহ আম আদমি পার্টি এবং তৃণমূলের বেআইনি অর্থে চলা ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি খুব সম্প্রতি কুখ্যাত হয়েছে তার নতুন ফেক নিউজের জন্য। এবার সে প্রচার করছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা নাকি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না বলে তাকে জানিয়েছে। আর তার এই ভিডিও বিশেষভাবে প্রচার করছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এমনকি নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে সরকারি কলেজেও তা দেখানো হচ্ছিল।

#WestBengal 🚨
Large screens are set to play videos of serial fake news peddler and anti India anti BJP propagandist #DhruvRathee / Badruddin Rashidi an ISI & Soros plant, at Govt college campuses in #WestBeogal .
This video is from Krishnanagar Govt College which is in the constituency of expelled MP #MahuaMoitra
@ECISVEEP should investigate into this and @NIA_India to look into this.
#LokSabhaElections2024
From @BhairavVaam

আসল খবরঃ

সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি মাননীয় চন্দ্রচূড় সাহেব আগেই জানিয়ে দিয়েছেন এরকম অভিযোগ এবং খবর সর্বৈব মিথ্যে। তিনি এবং তাঁরা দীর্ঘ কর্মজীবনে বর্তমান সরকারের থেকে কোনদিন কোন রকম রাজনৈতিক চাপ অনুভব করেননি।

ফেক পাকিস্তানি মিডিয়া

পাকিস্তানি মিডিয়া এবং তার সহযোগী দেশের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দেশবিরোধীরা প্রচার করতে থাকে কাশ্মীরি জঙ্গিরা নাকি ছ'জন ভারতীয় সেনার বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জওয়ানকে হত্যা করেছে।

আসল খবরঃ

এরকম খবর প্রচারের লক্ষ্য ভারতীয় সেনা সমেত রাষ্ট্রবাদী মানসিকতার মানুষের আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানা। অবশ্য এ খবর মিথ্যে প্রমাণিত হতে সময় লাগেনি।

'ট্রাই' নিয়ে ফেক ট্রাই

ফেক নিউজ এবং ফেক অর্ডার ছড়িয়ে সরকারবিরোধীরা প্রচার করতে থাকে টেলিফোন রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নাকি টাওয়ার বসানোর জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে ঘুষ নিচ্ছে।

আসল খবরঃ

বাস্তব সত্য হলো টাওয়ার বসানো সংক্রান্ত কোনো কার্যকলাপেই ট্রাই জড়িত নয়। তারা শুধুমাত্র একটা সার্ভিস প্রোভাইডার আর অবজার্ভার হিসেবে কাজ করে। স্বাভাবিকভাবেই ৫০০০ টাকা নেওয়ার খবর সম্পূর্ণ ফেক।

মক পোল নিয়ে ফেক ভিডিও

বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম সমেত প্রিন্ট মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া এক ফেক নিউজে দাবি করা হয় এক ব্যক্তি নাকি একাধিক ভোট দিচ্ছে একটি মেশিনে। সেই সংক্রান্ত ভিডিওটিও প্রকাশ্যে আসে। বলা হতে থাকে ভারতীয় জনতা পার্টি নাকি এভাবেই ভোট লুট করে।

আসল খবরঃ

যদিও তদন্তের পর জানা যায় এই ঘটনা মহড়া ভোট বা মক পোলের, যা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের উপস্থিতিতে করা হয় এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই অনেকগুলি করে ভোট দিয়ে দেখে নেয় ভোট প্রক্রিয়া ঠিকঠাকভাবে চলার উপযোগী কিনা। পরবর্তীতে মকপোলের সমস্ত ভোট মুছে মূল ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়।

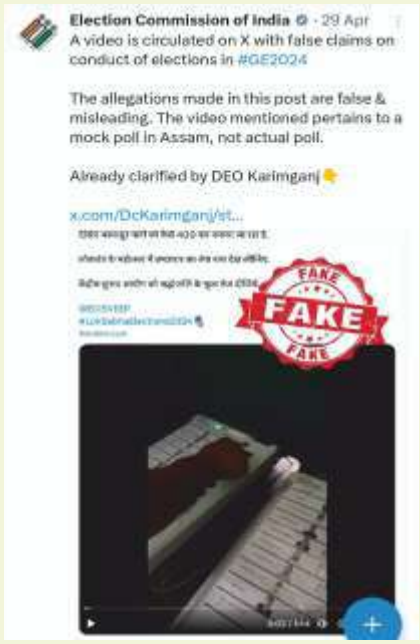

কৃষ্ণনগর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সমর্থনে নির্বাচনী রোড শোতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি।

উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে নির্বাচনী র‍্যালিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা।

হরিয়ানার পাঞ্চকুলায় নির্বাচনী রোড শোতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

সিউড়িতে বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে বিজয় সংকল্প সভায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সভায় মানুষের ঢল।

কর্মসংস্থান না বাড়লে

কীভাবে তৈরি হল এতগুলো মেডিক্যাল কলেজ?

কংগ্রেস বলবে, বিজেপি করবে

/BJP4Bengal bjpbengal.org

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টী.সি. দত্ত মার্চেন্টস প্রা.লি., কলকাতা - ৭০০ ০২৫ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।